সেচপত্র

জুন, ২০১৭

সেচপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

দ্বাবিংশ বর্ষ ◆ জুন ২০১৭

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি

রাজীব ব্যানার্জী

মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক

গৌতম চ্যাটার্জী

মুখ্য বাস্তুকার, সাউথ

সংযুক্ত সম্পাদক

রাজকাপুর শর্মা

নির্বাহী বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার

সহ-বাস্তুকার

জলসম্পদ ভবন • বিধাননগর, সল্টলেক

দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮ • ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৩৪-৬২৪৫ / ২৩২১-৪৯২৮ / ২৩৩৪-৬০৯৮

ই-মেল : dvcsc6816@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.wbiwd.gov.in এবং

e-procurement.www.wbiwd.gov.in → homepage → e.procurement wbtender.gov.in

হেল্প লাইন : জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর—১৮০০৩৪৫০১১৭

জলপাইগুড়ি, ক্লাব রোড—১৮০০৩৪৫৩২৫৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষে **সঞ্জয় কুণ্ডু** অধীক্ষক-বাস্তুকার, কর্তৃক জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত / ২০১৭

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সভাপতির ডেস্ক থেকে

পাঠকের কলম

আবেদন

বন্যা নিয়ন্ত্রণে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের আয়লায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ-এর পুনর্নির্মাণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কারের কাজে সেচ ও জলপথ বিভাগ

গৌতম চ্যাটার্জী, মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

পুরুলিয়ার মাটিতে 'জলতীর্থ'—একটি প্রতিবেদন • কৌস্তুভজ্যোতি পাল, অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিশনের অধীনে দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের উন্নতিকরণ ও আধুনিকীকরণ • গুরুপদ পাত্র, অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিম—কিছু কথা

• শুভাশীষ পাত্র, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

বন্যা নিয়ন্ত্রণে কান্দি মাস্টার প্ল্যান • প্রিয়ম গোস্বামী, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প

• বিভাসচন্দ্র বর্মণ, উপ-অধিকর্তা ও সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গবেষণা সহায়ক, সেচ ও জলপথ দপ্তর

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা ও তার প্রশমন

দিলীপ কর্মকার, সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

উন্নয়নের আর এক ধাপ— সুন্দরবনের চিমাগুড়ি ফুলডুবি খালের উপর দশ কপাট যুক্ত স্লুইস গেট নির্মাণ • অমিয় চক্রবর্তী, সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সম্পাদকীয়

'সেচপত্র' পত্রিকা বেশ কয়েক দশক পার করল। পত্রিকা প্রকাশে দেরি হলেও এই সংখ্যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের আয়লায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধের পুনর্নির্মাণ, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কারের কাজে সেচ ও জলপথ বিভাগ, পুরুলিয়ার মাটিতে জলতীর্থ— একটি প্রতিবেদন রেখেছি। এই সংখ্যায় থাকছে শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিশনের অধীনে দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের উন্নতিকরণ ও আধুনিকীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে কান্দী মাস্টার প্ল্যান, কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিম সম্পর্কে কিছু কথা। আছে আমাদের সেচ ও জলপথ বিভাগের অধীন অতি প্রাচিন রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে একটি রিপোর্ট। আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা ও তার প্রশমন এবং সুন্দরবন উন্নয়নে চিমাগুড়ি-ফুলডুবি খালের উপর দশ কপাট যুক্ত স্লুইস গেট নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা। এছাড়া পত্রিকাতে নিয়মিত বিভাগ যেমন থাকে।

এই সংখ্যাতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন তথ্যমূলক আলোচনা ও নির্মাণ কাজের রিপোর্ট, বিগত সংখ্যাগুলির মতো পাঠকদের কাছে গুরুত্ব লাভ করবে। অন্যান্য সংখ্যাগুলির মতো এই সংখ্যাটিও সকলের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা রাখি।

সভাপতির ডেস্ক থেকে

দ্বাবিংশতম বর্ষে পড়ল সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র'। নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণের পরবর্তীতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সেচ ও জলপথ বিভাগ রাজ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করে বহু কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে ও করে চলেছে। যার কিয়দংশের প্রতিফলন এই পত্রিকাতে পাওয়া যাবে। উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে বিভাগের প্রযুক্তিবিদদের সুচিন্তিত মতামত ও সমাজের বিদগ্ধজনের অভিমত প্রয়োজন। প্রয়োজন, কাজের এলাকায় সাধারণ মানুষেরও মতামত। 'সেচপত্র' পত্রিকা, বিভাগের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের ও মতামত আদান-প্রদানের দৃঢ় ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিমধ্যে তথ্যমূলক সেচপত্র পত্রিকা সমাজের মননশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

আশা করি, আগামী দিনে পত্রিকা প্রকাশে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকবে। পত্রিকার এই সংখ্যাটি সাফল্য লাভ করবে, এই কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে—

শ্রী রাজীব ব্যানার্জী

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

সেচ ও জলপথ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে সেচ ও জলপথ বিভাগ নিরলসভাবে তার কর্মকাণ্ড করে চলেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন রোধ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বহুমুখী কর্মকাণ্ড করে চলেছে এই বিভাগ। এই সকল কাজকর্মের বিষয় জনগণকে অবগতির লক্ষ্যে সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই পত্রিকা জনপ্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-সহ সমাজের বহু বিদগ্ধজনের কাছে সমাদৃত।

এই পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য বিভাগের সকলের কাছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ-সহ তাদের সুনিশ্চিত লেখনী ছবি-সহ জনসংযোগ ও পরিসংখ্যান শাখাতে পাঠাবার আবেদন রাখছি।

'সেচপত্র' পত্রিকা প্রকাশে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী
মুখ্য বাস্তুকার, সাউথ
ও
প্রধান সম্পাদক 'সেচপত্র'
সেচ ও জলপথ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম

মাননীয় সম্পাদক

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' পড়ে খুব ভালো লাগছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্বের চমৎকার সমাহার ঘটেছে সেচপত্রে।

পত্রিকায় 'ইরিগেশন আরকাইভ্‌স'-এর সংবাদ পেয়ে খুব ভালো লাগল। এর ফলে এই বিষয়ে উৎসাহী ছাত্র-শিক্ষক-প্রযুক্তিবিদ-সাংবাদিক থেকে শুরু করে আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকরাও বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। কর্তৃপক্ষকে এর জন্য আপনার পত্রিকার মাধ্যমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই পত্রিকার পাঠক হিসেবে দু-একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। পত্রিকাটি সরকারি মুখপত্র হওয়ার কারণেই এতে মূলত রাজ্যভিত্তিক বিষয়ই স্থান পাচ্ছে। এটি সারা ভারত জুড়ে প্রচার হওয়া দরকার। তাহলে সারা দেশের মানুষ বুঝতে পারবে— পশ্চিমবঙ্গ সরকারে এই সেচ ও জলপথ বিভাগ কিভাবে উন্নতির পথে কাজ করছে।

'সেচপত্র'-এর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ও বহুল প্রচার কামনা করি।

ইলা ঘোষ
৭২/বি অখিল মিস্ত্রি লেন
কলকাতা-৯

সমীপেষু সম্পাদক

মহাশয়,

সৌভাগ্যবশত দু-একটি সংখ্যা সেচপত্র দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের নদী, ড্রেনেজ বা চাষবাসে জলের জোগান ও বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের পত্রিকা থেকেই জানতে পারি। এ বিষয়ে আমরা যারা এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নই, আরও অনেক কিছু তথ্য জানতে পারি। কলকাতা ও তার আশেপাশের খালগুলির সম্বন্ধে আরও বিশদ লেখা আপনাদের পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে ভালো হয়।

ইতি—

বলরাম ঘোষ
ভারতীয় রেল কর্মচারি
বড়ডিবুর
জেলা-বীরভূম,

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল

(ক) পত্রিকার নাম	:	সেচপত্র
(খ) পত্রিকার ভাষা	:	বাংলা
(গ) প্রকাশের স্থান	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
(ঘ) প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
(ঙ) মুদ্রাকরের নাম	:	সঞ্জয় কুণ্ডু
(চ) মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা	:	ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
(ছ) প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	:	সঞ্জয় কুণ্ডু, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৯১
(জ) সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	গৌতম চ্যাটার্জী, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
(ঝ) স্বত্বাধিকারী	:	সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(ঞ) স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১

আমি সঞ্জয় কুণ্ডু এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : সঞ্জয় কুণ্ডু

বন্যা নিয়ন্ত্রণে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের আয়লায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধের পুনর্নির্মাণ, শক্তিশালী ও সংস্কারের কাজে সেচ ও জলপথ বিভাগ

গৌতম চ্যাটার্জী (মুখ্য বাস্তুকার)

সুন্দরবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :—

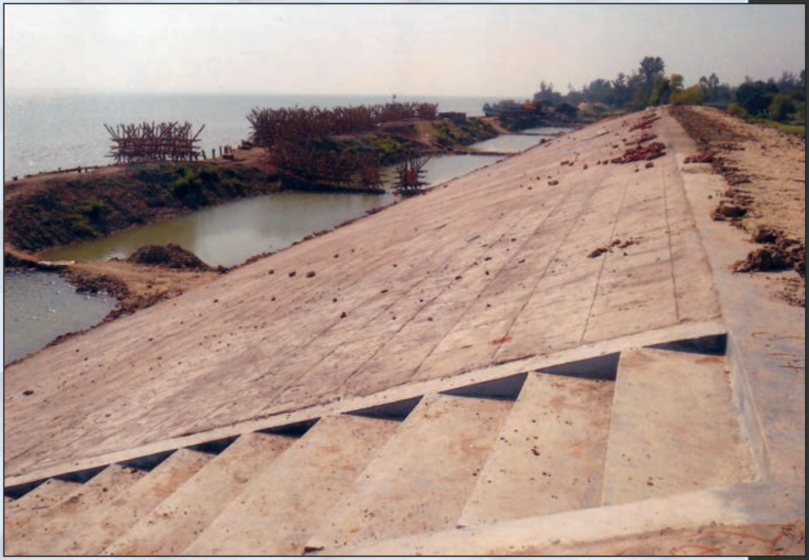

মূল নদী গঙ্গা, পরবর্তীতে হুগলি নদী, যে পরিমাণে পলি বহন করে নিয়ে আসে, তা ধারাবাহিকভাবে জমা হয়ে গড়ে উঠেছে এই সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল। এটা সঠিক যে গঙ্গা অববাবিহকায় যুগের পর যুগ নিয়মিত নিয়ে আসা পলি জমা হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই ব-দ্বীপ গড়ে ওঠার জন্য সমুদ্র সংলগ্ন নদীর জোয়ার-ভাটা মূলত কাজ করছে। গঙ্গা অববাহিকার মূলস্রোত পদ্মার অভিমুখে যাওয়ার জন্য গঙ্গা, ভাগীরথী অববাহিকার সংলগ্ন সকল শাখা নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে, ফলে জলবাহিত হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বর্ষাকালের কয়েকটি মাস বাদ দিলে এই নদীগুলির জলবহন ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে যায়। এই সময়ে নদীগুলি ব-দ্বীপ গঠন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। নতুনভাবে ব-দ্বীপ গঠন হওয়া নির্ভর করে শুধুমাত্র জোয়ার-ভাটার উপর। এই সময় বহু নদী অববাহিকাতে বর্তমানে জোয়ার-ভাটা খেলে না, উপরন্তু ওই সকল অববাহিকা সংলগ্ন এলাকার নিকাশি জল এই প্রাকৃতিক ড্রেনেজ চ্যানেলের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বনাঞ্চল সমগ্র সুন্দরবন, ভারতবর্ষের সীমানার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই সুন্দরবন ব-দ্বীপের কিছুটা অংশের অবস্থান হুগলি নদীর শেষাংশে ও অন্য অংশের অবস্থান বাংলাদেশের পদ্মা নদীর পশ্চিমাংশ ও মেঘনা নদীর উত্তর-পূর্বাংশে।

এটা বিশ্বাস করা যায় যে প্রাথমিকভাবে গঙ্গা অববাহিকা ও ব্রহ্মপুত্র নদের প্রচুর পলি বহন করে নিয়ে আসার ফলে এই সুন্দরবন অঞ্চল গঠন হয়েছে। সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২.০৫ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ০.৭৯১ মিলিয়ন হেক্টর ভূখণ্ডের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলাতে।

পলি মাটি স্তরে স্তরে জমা হয়ে এই অঞ্চলে জমি উঁচু হওয়ার সময় কিছু মানুষ সেটি দখল করে মূলত চাষবাস করার জন্য। পরবর্তীতে ওই স্থানের বন কেটে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রবণতা শুরু হয় প্রায় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কিন্তু আইনগত ভাবে ও প্রথা মেনে এই বনাঞ্চলের জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিশেষ ইজারা দেওয়া শুরু হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে সুন্দরবনের সীমারেখা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। পূর্বে এই অঞ্চলের সকল মাটির নদীবাঁধ এলাকার জমিদারদের অধীনে ছিল। ১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসে জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্ত নদীবাঁধ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে। এই এলাকা ছিল ঔপনিবেশিক এলাকা। এখানে ৪০টি এস্টেট ৪০টি সরকারি তত্ত্বাবধানে খাস মহল ও ৩৮৪টি জমিদারী এস্টেট ছিল। এইসব এলাকা খাস করে জমিদারদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকা সমস্ত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের অধীনে নেয়।

২০০৯ সালের বিধ্বংসী ঝড় আয়লা :

বিধ্বংসী ঝড় আয়লা বয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মূলত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার উপর দিয়ে। ২৫ মে ২০০৯ সালে প্রায় দুপুর ২টার সময় এই বিধ্বংসী ঝড় দুটি জেলাতে আছড়ে পড়ে, সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ১২০ থেকে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এই ঝড়ের গতিবিধির তীব্রতা উত্তরমুখী হবার কারণে উত্তর ও দক্ষিণ-২৪ পরগনা জেলা ব্যতীত পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ দার্জিলিংয়ে বিস্তার করে ক্রমে এর গতি মন্থর হয়ে যায়। ঝড়ের প্রভাবে জোয়ার-ভাটার সময় সমুদ্রের জলের তল প্রচণ্ড বেগে ওঠা নামা করে। পরের দিন সাগরদ্বীপের জলতলের উচ্চতা নিরূপণ করে দেখা যায়, স্বাভাবিক জলতলের উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৩.৩ মিটার বেশি হয়েছিল। এই জলতলের উচ্চতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অগুনিত স্থানে মাটির বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল বইতে থাকে। বহু স্থানে মাটির বাঁধ বসে যায়, ভেঙে যায় আবার কোনো কোনো স্থানে বাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নদীর বাঁধ ভেঙে বা বাঁধের উপর দিয়ে বিশাল জলরাশি বাঁধ সংলগ্ন এলাকা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মাঠঘাট প্লাবিত করে। হাজার হাজার ঘরবাড়ি, কুঠির ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু স্থানের রাস্তাঘাট ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশাল ক্ষয়-ক্ষতি হয় সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল সহ উত্তর ও দক্ষিণ-২৪ পরগনা জেলার আরো বেশকিছু এলাকা। সুন্দরবনের সমগ্র নদীবাঁধের (প্রায় ৩১২২ কিমি) রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে সেচ ও জলপথ বিভাগ। আয়লার প্রকোপে ১৭৭ কিমি নদীবাঁধ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর ৬০১ কিমি নদীবাঁধ অতি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ৭৭৮ কিমি সুন্দরবনের নদীবাঁধ যা আয়লার ভয়াবহ প্রকোপে ভেঙে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সব স্থানে নতুনভাবে বাঁধ নির্মাণ না করলে, ভবিষ্যতে আয়লার মতো বিধ্বংসী ঝড়ে বা তার থেকেও কম তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ে আবার বাঁধের ভয়াবহ ক্ষতি হতে বাধ্য।

ভারত সরকার কর্তৃক টাস্কফোর্স গঠন :

বিধ্বংসী আয়লায় সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের জন্য মে, ২০০৯ সালে ভারত সরকারের জল আয়োগ (Union Ministry of Water Resources) টাস্কফোর্স (Task Force) গঠন করে। টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভাতে সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতিসম্পন্ন নদীবাঁধের আশু সংস্কারের জন্য মোট ৭৭৮ কিমি দৈর্ঘ্যের নদীবাঁধের (যার মধ্যে ১৭৭ কিমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নদীবাঁধ ও ৬০১ কিমি দৈর্ঘ্যের অতি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নদীবাঁধ) পুনর্গঠন, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কারের জন্য সেচ ও জলপথ বিভাগ প্রস্তাব রাখে। পরবর্তীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প টাস্ক ফোর্স-এর দেওয়া সূত্রানুসারে এবং নির্দেশে তা অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প কাজের শ্রেনীবিভাগ :

বাঁধের পুনর্গঠন, শক্তিশালীকরণ ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, বাঁধের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি অনুসারে ও তত্ত্বাবধানের বিবেচনায় কাজকে ছয় ভাগে বিভাজন করা হয়েছে।

বিভাজন	বিবরণ	মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)
১এ	সমুদ্রতটের নিশ্চিহ্ন বাঁধের পুনর্নির্মাণ, বাঁধের মধ্যবর্তী অংশে সমুদ্রের বালি ভর্তি করে জিও টিউব ব্যবহার ও বাঁধ তৈরির কাজে স্থানীয় মাঠের মাটি ব্যবহার, সঙ্গে সমুদ্রের দিকে বাঁধের ঢালে ব্লক পিচিং ব্যবহার।	১০.২০
১বি	নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নদীবাঁধের স্থানে পুনরায় বাঁধ নির্মাণ (যে নিশ্চিহ্ন স্থানের দৈর্ঘ্য ১ কিমি বা তার অধিক) ও নদীর বেডের মালমশলা ব্যবহার করে এবং নদীর দিকে বাঁধের ঢালে ব্লক পিচিং ব্যবহার করে।	২৮.৮০

বিভাজন	বিবরণ	মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)
১সি	নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নদীবাঁধের স্থানে পুনরায় বাঁধের নির্মাণ (যে নিশ্চিহ্ন স্থানের দৈর্ঘ্য ১ কিমি-এর কম) ও নদীর বেডের মালমশলা ব্যবহার করে এবং নদীর দিকে বাঁধের ঢালে ব্লক পিচিং ব্যবহার করে।	১৩৭.৯০
২এ	সমুদ্রতটের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ ও উন্নতি সাধন, বাঁধ সংলগ্ন মাঠের মাটি ব্যবহার করে এবং সমুদ্রের দিকে বাঁধের ঢালে ব্লক পিচিং ব্যবহার।	৮.৭
২বি	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ ও উন্নতি সাধন, বাঁধ সংলগ্ন মাঠের দিকের মাটি বা অন্য কোনো স্থানের মাটি ব্যবহার করে এবং বাঁধের দুই ধারের ঢালে অর্থাৎ নদীর দিকে ও মাঠের দিকে ব্লক পিচিং ব্যাবহার করে।	৪৪৭.১
২সি	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ ও উন্নতি সাধন, বাঁধ সংলগ্ন মাঠের দিকের মাটি বা অন্য কোনো স্থানের মাটি ব্যবহার করে কিন্তু নদীর দিকে কোনো ব্লক পিচিং না করে।	১১৫.০০
	মোট	৭৭৭.৭৫

ধরাযাক মোট ৭৭৮.০০ কিমি

প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার বহন করা সংক্রান্ত বিষয় :

প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মোট খরচ অনুমোদন হয় ৫০৩০.০০ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত—অর্থনৈতিক বিষয়ের (Techno economic) অনুমোদন দেয় গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগ (Ganga Flood Control Commission)। ২৮.০১.২০১০ তারিখে ১০২তম সভাতে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বহুমুখী প্রকল্পের MOWR-এর অ্যাডভাইসারি কমিটি (Advisory Committee of Irrigation Flood Control and Multipurpose Project of MOWR)-এর অনুমোদন দেয়।

প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনকে (Planning Commission) জানানো হয় এবং ২৬-০৭-২০১০ তারিখে এই প্রকল্পের জন্য ৫০৩২.০০ কোটি টাকা অনুমোদন হয়।

রাজ্যের জন্য ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ ওয়াটার রিসোর্সেসে (Ministry of Water Resources) যে সকল স্কিম আছে তার মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামে [(Flood Management Programme (FMP)] দেয় অর্থের সাহায্যে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এমপাওয়ার্ড কমিটি (Empowered Committee) তাদের ষষ্ঠ সভাতে প্রথম পর্যায়ে পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য আনুমানিক খরচ হিসেবে ১৩৩৯.৫০ কোটি টাকা রেখেছে।

২০১৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের প্রকৃত অগ্রগতি ও অর্থ খরচের বিষয় :

এই প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য ইতিমধ্যে স্থান চিহ্নিত করা শুরু করেছেন, যেখানে সঙ্গতিপূর্ণ বা প্রকৃত অর্থের বিনিময়ে জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যে উত্তর ২৪-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে ৯৯৫ একর জমি এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ১৪৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের মোট খরচের অনুপাত ৭৫ : ২৫ শতাংশ হারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দেয় অর্থের ভিত্তিতে হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই অর্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছরে আনুমানিক ৫২৫.০০ কোটি টাকা প্রকল্প খরচের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সেচ ও জলপথ দপ্তরের দায়বদ্ধতা আছে।

পুরুলিয়ার মাটিতে জলতীর্থ

কৌস্তভজ্যোতি পাল (অধীক্ষক বাস্তুকার)

পুরুলিয়ার অধীক্ষক বাস্তুকার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ২০১৩ সাল থেকে চেক ড্যাম নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। সেচ ও জলপথ দপ্তরের সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত গণ্ডীর সীমাবদ্ধতার পরিসর থেকে চেক ড্যামের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য এই লেখার বক্তব্য একজন অধীক্ষক বাস্তুকারের অনমনীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করে একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিরিখে লিখিত হল। পুরুলিয়ার দাবদহ ও চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় সরকারি দপ্তরের কোনো কর্মচারীর বদলি বা নিয়োগকে কিছুটা হলেও অপেক্ষাকৃত কঠিন বদলি বা নিয়োগ বলে গণ্য করা হয়। অথচ বাস্তব এটাই যে— পুরুলিয়াতে বদলির আদেশনামা হাতে পেলে একজন কর্মচারি যতটা অস্থির হন, কার্যকাল ফুরোলে পুরুলিয়া থেকে বদলির আদেশ হাতে পেলে মন তার চেয়ে অনেক বেশি ভারাক্রান্ত হয়। এটাই পুরুলিয়ার মানবিক দিক যা রক্তমাংসের মানুষকে হৃদয়ের অতলতলেও স্পর্শ করে। আদিবাসী সংস্কৃতি ও কৃষিভিত্তিক জীবনধারার সংমিশ্রণ পুরুলিয়া, যেখানে আজও পৌষপার্বন ও টুসুপূজা সবচেয়ে বড় উৎসব। তার পরেই স্থান মনসাপূজার— যখন গোটা পুরুলিয়া দুদিন ব্যাপী উৎসব যাপনে ব্যস্ত থাকে।

পুরুলিয়া জেলা—

আয়তনে রাজ্যের বৃহত্তম জেলা, গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৩৫ মিটার উচ্চতায় পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়া-মেদিনীপুর, থেকে প্রায় ২০০ মিটার উঁচুতে। এখানে পর্যাপ্ত বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (১২০০মিমি) হওয়া সত্ত্বেও জেলাটি প্রয়োজনীয় জলধারণে অক্ষম। এই জেলা বরাবরই খরাপ্রবণ ও জলসঙ্কটে ক্লিষ্ট ছিল, যার অনেকটাই আজ পরিবর্তনের পথে অগ্রসর। কিন্তু আবশ্যক জলের সংস্থান না থাকার ফলে শিল্প স্থাপনের সুযোগও ঘটেনি যা আজ অগ্রাধিকার পাচ্ছে পরিকল্পনায়।

কিছু ইটভাটা স্থানীয় মানুষের রুজিরোজগারে সাহায্য করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও পশুপালন এখানের মানুষের

প্রধান অবলম্বন। গত ২০০৭-এর আদমশুমারির পরিসংখ্যানে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পরিবার ছিল দারিদ্র সীমার নিচে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সরকারি উদ্যোগে ক্রমাগত উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে বিভিন্নভাবে অজস্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে চলেছে। তদুপরি খাদ্য সুরক্ষার সরকারি প্রকল্প এই জেলার দারিদ্র-ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপহার। গত আদমশুমারির পরিসংখ্যানে স্বাক্ষরতা ছিল পুরুষ প্রায় ৮০ (আশি) শতাংশ এবং মহিলা ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের সামান্য বেশি। বর্তমান সংবাদ মাধ্যমের মতামত অনুযায়ী কন্যাশ্রীর মতো বিভিন্ন উৎসাহপ্রদানকারী প্রকল্পের ফলে নারী স্বাক্ষরতার ব্যাপক প্রসার ঘটে চলেছে।

বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ধাপে ধাপে অগুনতি 'জল ধরো জল ভরো' পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে সমগ্র জেলার জলধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধিতে ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করেছে। নদ-নদীর মধ্যে দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর ও কুমারী এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু জেলার উচ্চতা নদীগুলিকে খরস্রোতা ও শীর্ণ করেছে। গ্রীষ্মকালে যাদের প্রবাহ প্রায় ভূপৃষ্ঠের নীচেই থেকে যায়।

চেক ড্যাম কি?

বড় বড় নদীর উপর ড্যাম নির্মাণ করে বৃহৎ জলাধার তৈরি হয়। ছোট ছোট ঝোরা বা ক্ষুদ্র শাখানদী বা উপনদীর উপর চেক ড্যাম করার ফলে তৈরি হয় এক একটি ক্ষুদ্র জলাধার। পুরুলিয়াতে বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত হলেও বর্ষার প্রারম্ভে এখানে চাষিরা সেই বৃষ্টিপাতের সুবিধা লাভে সক্ষম হয় না। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কিছু মাটির বাঁধ তৈরি করে সাময়িকভাবে চাষিরা ঝোরার জলস্রোতের গতিরোধ করে চাষের জন্য কিছু জল আহরণ করতে সক্ষম হয় বটে তবে প্রবল বর্ষায় ভীষণ খরস্রোতা জলপথে ওই মাটির বাঁধ ভেঙে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। সেজন্য প্রয়োজনীয় জল সংগৃহীত না হলে সম্পূর্ণ জমিতে চাষের সুবিধালাভে বঞ্চিত হয় চাষিরা। কংক্রিটের চেক ড্যাম নির্মাণ করলে চাষিরা সমগ্র বর্ষাকাল জুড়ে এখানে জল পায় এবং বর্ষার পরেও সঞ্চিত জলাধার থেকে শীতকাল পর্যন্ত রবি শস্য বা অন্যান্য শাকসবজি উৎপাদন করে। পুরুলিয়া জেলার অস্বাভাবিক উচ্চতার ফলে এখানে বন্যা বা ভাঙনের সমস্যা নেই। বর্ষার হড়কা বান বা জলস্ফীতি (Flash Flood) এখানে চাষিদের তথা সাধারণ মানুষকে যারপরনাই পুলকিত করে। কখনো কখনো এই জলস্ফীতি দু-চার ঘণ্টার জন্য চাষিদের জমি প্লাবিত করে। কিন্তু এই প্লাবন চাষিদের মধ্যে কোনো হাহাকার সৃষ্টি করে না। বরংঞ্চ বহন করে নিয়ে আসে উর্বর পলিমাটি ও উৎসবের আনন্দ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়াতে জলের সংস্থান প্রায় নেই বললেই চলে। ফাটাফুটা জমি তখন জলাধারের তলানিও শুষে নেয়। আর প্রচণ্ড উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয় খুব দ্রুতহারে। মানুষের দুর্দশা তখন সীমাহীন। পশুপালন গ্রামবাসীদের আর একটি অবলম্বন—যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও জল চাই। পুরুলিয়ার বুকের ওপর বয়ে যায় যে নদ-নদী তাদের অবস্থানও তখন সঙ্গিন; বহুক্ষেত্রেই ধারা অতীব ক্ষীণ অথবা অদৃশ্য। এই সময় অবশ্য অধিকাংশ চেক ড্যামেও জল থাকে না—একমাত্র কিছু চেক ড্যাম বাদে যা সর্বদা (Perenial Source) বহমান উৎসের গতিপথে নির্মিত বা মাটির নিচুস্তরের জলধারায় পুষ্ট। যদিও সেচ ও জলপথ দপ্তরের ৩২টি সেচ প্রকল্পের বেশিরভাগ জলাধার এই বিপদকালীন পরিস্থিতিতেও জল সরবরাহ করতে সক্ষম। কিন্তু বর্ষাকালে অথবা বর্ষার আগে বা পরে শীতকালীন অকাল বৃষ্টির লাভ ও সুফল একমাত্র চেক ড্যামই সুরক্ষিত করে। ফলে চেক ড্যামের জলাধারে কেবল চাষই হয় না, গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন পানীয় জল আহরণ, অবগাহন, পশুপালন, মৎস্যশিকার, গরু-ছাগলের খাদ্যের একপ্রকার দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস রোপণ (Foodder Cultivation), লাক্ষাচাষে ব্যবহৃত পলাশ গাছের বৃদ্ধির জন্য জল সরবরাহ ইত্যাদি বহুবিধ উপকার মেলে। আর পরোক্ষ উপকার হিসাবে তো ভূমিতলের জলপৃষ্ঠ উত্তোলন এবং বনসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। সাম্প্রতিককালে পুরুলিয়াতে ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিটা চেকড্যাম সংলগ্ন অঞ্চল প্রভূত পর্যটককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত গ্রামবাসীদের একটি বড় দাবি থাকে চেকড্যামের মাধ্যমে খরস্রোতা ঝোরাগুলির দুই পাড়ের সংযোগ স্থাপন। বর্ষার খরস্রোত ও হড়কা বানের সময় জলপথ অতিক্রম করা সংলগ্ন দুই পাড়ের গ্রামবাসীদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধাজনক। কিন্তু চেক ড্যামের কংক্রিটের বাঁধের উপর দিয়ে সতর্কতা সহকারে যাতায়াত করা সম্ভব হয়। চেক ড্যামের নীচে বড় বড় নল রাখা হয় যাতে পলিমাটি মিশ্রিত জল ওই পথে নিষ্কাশিত হয় নতুবা পলিমাটি জমে চেক ড্যামের জলধারণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটাতে পারে। চেকড্যাম থেকে সাধারণত পাম্পের মাধ্যমেই জল উত্তোলন করা হয়, তারপর তা পৌঁছায় চাষের জমিতে। চেকড্যাম সংলগ্ন জমিগুলি বা নিকটবর্তী জমিতে চাষের সুযোগ ঘটে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো Multi Stage Pumping-এর মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্তও জল পৌঁছে যায়। প্রথমে পাম্পের মাধ্যমে চেকড্যাম থেকে নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ে জল ভরা হয়, পরে ওই জলাশয় থেকে অনতিদূরে অন্য জলাশয়ে দ্বিতীয় পাম্পের মাধ্যমে জল পৌঁছায়। এইভাবেই বহুস্তর পাম্পিং সফলভাবে দূরবর্তী স্থানে জলকে পৌঁছে দেয়।

‘জলতীর্থ প্রকল্প’—

উন্নয়নের অগ্রগতির একটি বিশাল ধাপ। এই জেলার অধিবাসীরা বহুদিন যাবৎ বৃষ্টির খামখেয়ালিপনার হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসবাস করছেন। আদিবাসী ঘরানার স্বভাবসুলভ শান্তিপ্রিয় আনুগত্য ও স্বল্পেতেই সন্তুষ্টি এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুন্নয়নের পর্বতসম বোঝাও মনকে বিচলিত করে না, অভিযোগের উপস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত করে না। যদিও অতীতে দীর্ঘদিন অনুন্নয়নের পাহাড়ে ‘চাপা পড়া মানুষ’ কখনো কখনো অসহিষ্ণুতার উত্তাপ প্রকাশ করেছে। বহুকাল এই জেলা দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন (Alienated) বা নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও তপ্ত প্রতিবাদের প্রবৃত্তি এখানে ছিল না। বর্তমানের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এই জেলার জমে থাকা অসন্তোষ ও অভিযোগজনিত হতাশা খড়কুটোর মতন ভেসে চলে গেছে। খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়া জেলা প্রকৃত অর্থেই মেতে উঠেছে উন্নয়নের ‘জলতীর্থে’। এর ফলে কেবল সেচসেবিত চাষের জমি তৈরি হয়নি, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে জীবিকা নির্বাহের সংস্থান হয়েছে অজস্র দরিদ্র পরিবারের। এই জেলাতে বর্তমান উন্নয়নের জোয়ারে মানুষের গড় ক্রয়ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান।

২০১৩-১৪ সালে সেচ দপ্তর প্রথমে পুরুলিয়াতে রাষ্ট্রীয় কৃষাণ বিকাশ যোজনায় ৭টা চেকড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অর্থমূল্যে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রভূত আশা-আকাঙ্ক্ষার সাড়া মেলাতে সেচ ও জলপথ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী রাজীব ব্যানার্জী আরও ৭টা চেক ড্যাম Core State Plan-এ প্রায় পাঁচকোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আদেশ দেন। এই চেক ড্যামগুলির নির্মাণকালে অভাবনীয় সাড়া ও উচ্ছ্বাসের নিদর্শন মেলে সমগ্র পুরুলিয়া জেলাতে। ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া চাষিসমাজ এতদিন বাদে দেখতে পেলেন প্রভূত সম্ভাবনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার রূপরেখা।

এমতাবস্থায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী: ‘জলতীর্থ’ প্রকল্পে প্রায় ৫০০ চেকড্যাম নির্মাণের ঘোষণায় সমগ্র পুরুলিয়ার চাষিরা মুগ্ধতায় হতবাক হয়ে গেলেন। জেলার ২০টা ব্লকের ওপর প্রায় ৫০০ চেকড্যাম যথার্থভাবেই উন্নয়নের পথে এক বিশাল সম্মুখবর্তী উল্লম্ফন (A Great Leap Forward)। বিভিন্ন দপ্তর যথা— পূর্ত, সেচ, ক্ষুদ্র সেচ, বন এবং সামাজিক দপ্তর এই চেকড্যাম নির্মাণের দায়িত্ব পান। কিন্তু মুখ্য রূপকার WRIDD (জল সম্পদ অনুসন্ধান ও বিকাশ দপ্তর)। সেচ দপ্তর প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৯টি চেক ড্যামের কাজ পূর্বেই সমাপ্ত করেছে। আরও ৮টি চেকড্যাম ছয় কোটি টাকা অর্থমূল্যে বলরামপুর ব্লকে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে আরও ২৭৪ হেক্টর চাষের জমি সেচসেবিত করার কাজ সহজ হবে।

মোট ৯৭টি চেক ড্যাম নির্মাণে ৩৪৬২ হেক্টর জমি সেচের আওতাভুক্ত হয়েছে। যেসব ব্লকগুলিতে এই কাজ হয়েছে সেগুলি হল—

আড়ষা (৩টি), বলরামপুর (৯টি), বড়বাজার (৫টি), হুড়া (৬টি), জয়পুর (১টি), কাশীপুর (১টি), মানবাজার-১ (৬টি), পাড়া (১টি), পুঞ্চা (১৯টি), পুরুলিয়া-১ (১৫টি), পুরুলিয়া-২ (১৭টি), রঘুনাথপুর (১৩টি) এবং সাতুরী (১টি)।

স্বীকৃতি হিসেবে সেচ ও জলপথ দপ্তরের কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের সাধারণ মানুষের থেকে এই কথাগুলি বারবার শুনতে হয়— ‘‘এবার সময় মত বৃষ্টি না হলেও আপনাদের চেক ড্যামের জল আমাদের চাষে ভীষণ উপকার করেছে। সম্ভব হলে আরও চেক ড্যাম করুন—পাশের এলাকাতে’’।

একদা উপদ্রুত এলাকা এখন শান্তির নীড়

জলতীর্থকে শুধু সংখ্যাতত্ত্বের গভীরে যারা বাঁধতে চেয়েছেন বা পরিসংখ্যানের কচকচিতে সীমাবদ্ধ চেয়েছেন, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন বুঝতে যে, পুরুলিয়ার মানুষের কাছে ‘জলতীর্থ’ কিভাবে এক মুক্তির স্বপ্ন রূপায়ণের বার্তা বয়ে এনেছে। সাধারণ মানুষ, জলসম্পদে বঞ্চিত মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে, জলসম্পদের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে কারিগরি বিজ্ঞানের আলোকে তার নির্মাণযোগ্যতা নির্ধারণ করে এক একটি স্বপ্নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। জলতীর্থ কেবল স্বপ্ন রূপায়ণ করেনি, ভবিষ্যতের আশাআকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছে। পুরুলিয়ার অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রতীক হয়ে উঠেছে জলতীর্থ। ফলে হতাশা-ক্রোধ-অভিযোগ-বিদ্রোহ দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীয়মাণ হয়েছে।

চেক্ ড্যাম নির্মানকাজে আমার একটি বাস্তা অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে: বলরামপুর ব্লকে ঘাটবেড়ায় একটা ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের নির্মাণযোগ্যতা অনুসন্ধানকালে একটা পাহাড় টপকে অন্য পাহাড়ে লঙ্ঘন (একদা উপদ্রুত মুক্তাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত এলাকা)প্রশাসনের কাছে ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে অঞ্চলটি শান্তির নীড় হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফ থেকে পরিদর্শনের সময় আমদের পাহারায় নিয়োজিত ছিল যৌথবাহিনীর বহুসংখ্যক সশস্ত্র জওয়ান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির অনুরোধে এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের ওপর এক গ্রামে যখন পৌঁছনো গেল, তখন আমাদের সঙ্গে অবশিষ্ট মাত্র দু-জন স্থানীয় যুবক ও একজন সশস্ত্র জওয়ান, অন্য সকলেই দীর্ঘ পাহাড়ি পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং আরোহণের বিভিন্ন ধাপে বিশ্রামরত। আমার সঙ্গী জওয়ানটি একবার সুযোগ পেয়েই ফিসফিস করে বলল— ‘‘আপনার পাশের ছেলেটিই উগ্রপন্থী, ওদের থেকে সাবধান।’’ আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম— ওরা ওদের প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের স্বাগত জানিয়েছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবে এটাও বুঝলাম যে, যুবক দুটিও জওয়ানটির মধ্যে এক অস্বস্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। আমি এদের মধ্যে যোগসূত্র বা সেতুবন্ধনের কাজ করছি। একবার যুবক দুজনকে আলাদা পেয়েই জিজ্ঞাসা করলাম— শুনেছি এককালে তো তোমরা অনেকেই অস্ত্র তুলে নিয়েছিলে— এখনও তোমাদের অভিযোগ কি আছে? খুব সহজ উত্তর এসেছিল। ‘‘দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তখন। খিদে তেষ্টায় মৃত্যুবরণ করার বদলে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম। আর এখন আমাদের এক ক্ষুদ্র চেকড্যাম করতে আপনারা এত লোক চলে এসেছেন। কাজটা হোক অথবা না হোক, কিন্তু আমাদের এই কষ্টের সুরাহা করার জন্য আপনারা কত কষ্ট করে পাহাড়ে উঠেছেন, দেখেছেন— এতে তো আমরা মুগ্ধ। আমরা কৃতজ্ঞ। এরকমতো আগে কখনো হত না। আমরাও যে মানুষ। এখনকার সরকার এটা উপলব্ধি করেন। তাই আমরা সবাই জেলার উন্নয়নের শরিক। ‘‘উন্নয়নের রূপরেখায় ও রূপায়ণে পিছিয়ে পড়া মানুষের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত রচনা ‘জলতীর্থের’ সাফল্যের অন্যতম উদাহরণ।

পরিশেষে

জলতীর্থে অবগাহন করে পুরুলিয়া জেলার নবজন্ম লাভ হয়েছে। খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়ায় জলতীর্থের কল্যাণে প্রয়োজনীয় জলের সংস্থানের সম্ভাবনাগুলো উন্মোচিত হচ্ছে। এই উন্মোচন কেবল পুরুলিয়ার জেলার জন্য উপহার নয়—মানবতার এক অভূতপূর্ব দান।

শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিশনের অধীন দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের উন্নতিকরণ ও আধুনিকীকরণ

গুরুপদ পাত্র (অধীক্ষক বাস্তুকার)

বিবরণ

মাঞ্ঝা নদী দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার অধীন পানিঘাটা অঞ্চলে হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যায়ে চেঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছে।

মাঞ্ঝা সেচ প্রকল্পটি দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি সমষ্টির সেবডেল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সেবডেল্লা, বিরসিং ও ফাকনা মৌজায় অবস্থিত। প্রকল্পের প্রধান কাজটি (হেড ওয়ার্কস) নকশালবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৪ (চার) কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবডেল্লা, ফাকনা, বিরসিং, গাজিরাম ও মহসিন মৌজার কৃষিচাষযোগ্য এলাকায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৯০০ মিলিমিটার এবং খরিফ মরশুমে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৩০০ মিলিমিটার। মূলত অনিয়মিত বৃষ্টিপাত চাষের পক্ষে বড় অন্তরায়।

জলসেচের সুবিধা প্রদানের জন্য নকশালবাড়ি সমষ্টির অধীন হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে মাঞ্ঝা নদীর ওপর সেচপ্রকল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়, শিলিগুড়ি সেচ দপ্তরের মাধ্যমে এবং মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৮০-৮১ অর্থবর্ষে। কিন্তু ১৯৮২ সালে বর্ষার মরশুমে অতি উচ্চহারে বন্যার জল নির্গমন (হাই ফ্লাড ডিসচার্জ) হওয়ার জন্য

এই প্রকল্পের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। উভয় পার্শ্বের প্রধান কাজের (হেড ওয়ার্কস) পরিকাঠামো, 'অ্যাফ্লাক্স বাঁধ', 'গাইড বাঁধ' যেগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেই কাজগুলির অধিকাংশ অংশের এবং সেচখাল নির্মাণ পদ্ধতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয় যা ওইরূপ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়েছিল।

২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের আধুনিকীকরণ ও উন্নতিকরণ করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়।

এই অঞ্চলের মাটি কিছুটা বালিযুক্ত, সারযুক্ত এবং উর্বর। এখানকার জমি রবি ও খরিফ উভয় প্রকার চাষের পক্ষে উপযুক্ত। মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্প রূপায়ণের ফলে রবি ও খরিফ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল যাতে সারা বছর পাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করা গেছে।

মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্প রূপায়ণের ফলে এতদ্‌অঞ্চলের পরিবেশ, জলবায়ু এবং অন্যান্য কোনো বিষয়ের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েনি। এই অঞ্চলটি কৃষিচাষযোগ্য এলাকা এবং এই অঞ্চলে কোনো বনভূমি নেই। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত। এঁরা গরিব এবং এঁদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

মাঞ্ঝা সেচ প্রকল্পের সামগ্রিক সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ১০৭৫ হেক্টর এবং মূল সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ৭৫০ হেক্টর। এই প্রকল্পটির দক্ষিণদিকে নর্থ ফ্রন্টিয়ার ব্রডগেজ রেলপথ, পশ্চিমদিকে নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাস্তা, উত্তরদিক আশাপুর চা-বাগান

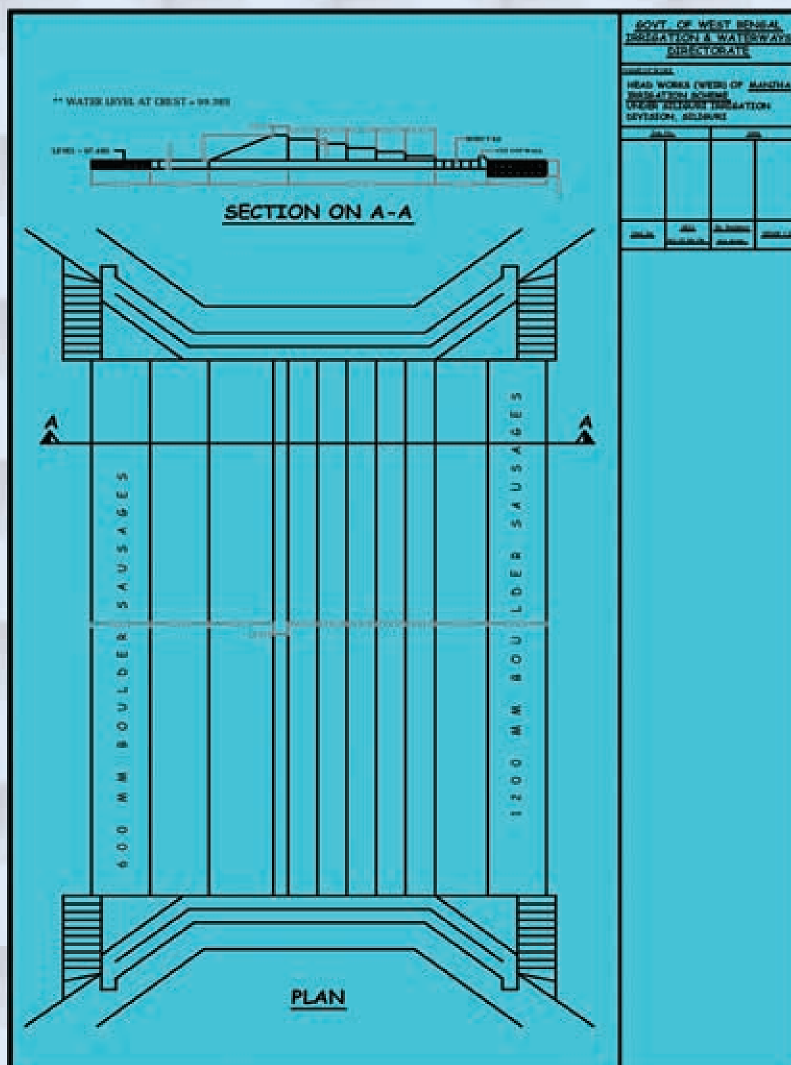

MANJHA IRRIGATION SCHEME – Technical Data

Left Bank Main Canal : 960 m
Right Bank Main Canal : 1500 m
Left Bank Link Canal : 1110 m

Catchment area : 10 Sq. Mile (26 Sq. Km.)
Discharge Q : 159.252 Cumec
Benefitted area : 1075 Ha. (Gross)
a) Kharif : 750 Ha.
b) Rabi : 640 Ha.

Section of LBMC :-

0 to 500 M

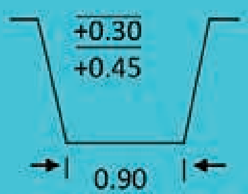

Q_r = 0.267 Cumecs
Q_d = 0.268 Cumecs

500 m to 960 m

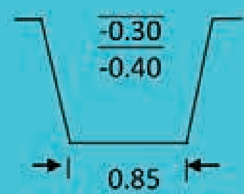

Q = 0.20 Cumecs

Section of RBMC :-

0 to 200 M

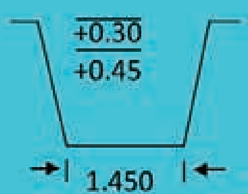

Q_r = 0.469 Cumecs
Q_d = 0.472 Cumecs

200 m to 1000 m

Q = 0.278 Cumecs

1000 m to 1500 m

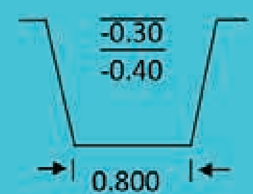

Q = 0.167 Cumecs

Section of LBLC :-

0 to 1110 M

Q_r = 0.10 Cumecs
Q_d = 0.21 Cumecs

Q_{design} = 0.472 + 0.268 + 0.21 = 0.95 Cumecs
$Q_{required}$ = 0.469 + 0.267 + 0.10 = 0.836 Cumecs

Head Regulator : 2 nos.
Tail Regulator : 3 nos.
Fall with regulator : 2 nos.
Cart Bridge : 2 nos.

ও পূর্বদিক চেঙ্গা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্প থেকে খরিফ শস্যের জন্য ০.৮৩৩ কিউমেক বা ২৯.৪২ কিউসেক জল এবং রবি শস্যের জন্য ০.৭১১ কিউমেক বা ২৫.১১ কিউসেক জল চাষের জন্য ছাড়া যায়।

মাঞ্ঝা সেচ প্রকল্পের প্রধান কাঠামোর কাজ (হেড ওয়ার্কস) থেকে বাম দিকে বাঁ-হাতি প্রধান সেচখাল এবং ডানদিকে ডানহাতি প্রধান সেচখাল প্রধান পরিচালন গেটের (হেড রেগুলেটর) মাধ্যমে বের হয়েছে। বাঁ-হাতি প্রধান সেচখাল থেকে আবার একটি বাঁ-হাতি শাখা খাল বের হয়েছে।

ডানহাতি সেচখালটি ১৫০০ মিটির দীর্ঘ। এই সেচখালের মধ্য দিয়ে নির্গমিত জলের পরিমাণ (ডিসচার্জ) ০.৪৬৯ কিউমেক। এই সেচখালের জল নির্গমন পথের (আউটলেট) মাধ্যমে সরাসরি কৃষিজমিতে যায়, ডানহাতি সেচখালের মাধ্যমে সেবডেল্লা মৌজা এবং বড়ঝাড়ু মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকা সেচসেবিত হয়ে থাকে। এই সেচ খালের শেষে টেইল রেগুলেটর আছে এবং এই সেচখালের উপর একটি এক্কাসেতু (কার্টব্রিজ) আছে।

বাঁ-হাতি প্রধান সেচ খালটি ৯৬০ মিটার দীর্ঘ। এই সেচখালে দুটি ফল উইথ রেগুলেটর এবং একটি এক্কাসেতু (কার্টব্রীজ) আছে। বাঁ-হাতি প্রধান খালের নির্গমিত জলের পরিমাণ (ডিসচার্জ) ০.২৬৭ কিউমেক এবং এই জল নির্গমন পথের (আউটলেট) মাধ্যমে বিরসিং মৌজা, গাজিরাম মৌজা এবং মহসিং মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকা সেচ সেবিত হয়ে থাকে।

বাঁ-হাতি প্রধান সেচ খালের বাম পার্শ্ব হতে বাঁ-হাতি শাখাখাল বের হয়েছে। এই খালটি ১১১০ মিটার দীর্ঘ। এই সেচখালের মধ্য দিয়ে নির্গমিত জলের পরিমাণ (ডিসচার্জ) ০.১০ কিউমেক। বাঁ-হাতি শাখা খালটি হল নির্গমন পথের (আউটলেট) মাধ্যমে সরাসরি বিরসিং মৌজার কৃষিজমিগুলিকে সেচ সেবিত করছে।

মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্প সারা বছর কৃষি চাষযোগ্য জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের জোগানে সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। একফসলী জমি এবং পতিত জমিতে সারা বৎসর চাষের ফলে তা জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে ও ফলস্বরূপ এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। মাঞ্ঝা সেচপ্রকল্পের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকীকরণ সদর্থক রূপ ধারণ করতে চলেছে।

কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিম—কিছু কথা

শুভাশীষ পাত্র (নির্বাহী বাস্তুকার)

ভারতের বৃহৎ অববাহিকা গঙ্গার শেষাংশ আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। এই গঙ্গার শাখা-প্রশাখাই কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই নদী, যা রাজ্যের দুটি জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত। এই দুই জেলার বিস্তীর্ণ অংশ ভৌগোলিক কারণে অপেক্ষাকৃত নিচু হবার জন্য অতি বৃষ্টির জল এই নদীগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীর ধারণক্ষমতা যথেষ্ট না থাকার কারণে অতিরিক্ত জল নদীগুলির দুকূল ভাসিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে থাকে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা থেকে স্থানীয় জনগণকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এবং এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিম প্রস্তুত করা হয়।

প্রকল্পটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ও নারায়ণগড় এই দুটি ব্লকের সম্পূর্ণ অংশ এবং পিংলা ও দাঁতন-১ ব্লকের আংশিক অংশ এই প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকের সম্পূর্ণ অংশ এবং পটাশপুর ও ভগবানপুর-১ ব্লকের আংশিক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রকল্পটি।

পূর্বে এই এলাকার নদী ও খালগুলি ছিল অগভীর ও সংকীর্ণ। কেলেঘাই নদীর ডান ধারে ও বাঁধারে গোবিন্দপুর থেকে উজানে এবং সবং ও ময়নায় অবস্থিত বিভিন্ন খালগুলির দুধারে বিস্তীর্ণ এলাকায় কোনো বাঁধ ছিল না। এর ফলে অল্প বর্ষাতে খালসমূহের সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হত এবং অনেক দিন ধরে জলমগ্ন থাকত। এলাকায় জল জমে থাকার ফলে বর্ষার মরশুমে এলাকার চাষীরা তাদের জমিতে চাষাবাদ করতে পারত না। জল জমে থাকার কারণে এলাকায়

Keliaghai River at Seulipur during excavation

Kalimandap Khal at Nimki Mohar during excavation

Kapaleswari River during re-excavation at Uttar Banaboni

পরিবেশ দূষণ হত। দীর্ঘদিন জল জমে তার পচনের ফলে রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিত। কেলেঘাই নদীর দুধারে বেশিরভাগ অংশতে ছিল জমিদরি আমলে তৈরি ঘের বাঁধ। সেগুলি ছিল জীর্ণ, কম উচ্চতার ও অপ্রশস্ত। এলাকাতে অতি বর্ষার সময় নদীর জল এইসব বাঁধের অতি দুর্বল অংশ ভেঙে ও বাঁধ ছাপিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে যেত। এলাকার জনগণও জলবন্দী হয়ে থাকত। একদিকে যেমন চাষাবাদ করতে পারত না, অন্যদিকে এলাকার ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, সংরক্ষিত শস্য ও অন্যান্য সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হত এলাকাবাসী।

কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই নদীসমূহ গঙ্গা অববাহিকার শেষ প্রান্তে অবস্থানের ফলে এই নদীসমূহের সংলগ্ন এলাকাতেও বন্যার প্রাদুর্ভাব বেশি। মূলত বর্ষার সময় যে পরিমাণ জল নদীগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই পরিমাণ জলধারণ ক্ষমতা এই নদীগুলির না থাকার ফলে সংলগ্ন এলাকায় বন্যা হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই অববাহিকার নদী সমূহের জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নদী ও খালের দুই ধারের বাঁধ প্রশস্ত ও দৃঢ় করে এলাকাকে বন্যার প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পে পাঁচটি নদী— কেলেঘাই নদীর ৬৩.০০ কিমি, কপালেশ্বরী নদীর ২০.২৫ কিমি, বাঘাই-এর ২৪.০০ কিমি, দেউলি নদীর ৯.৪৭ কিমি, ও চণ্ডিয়া নদীর ২৪.০০ কিমি পথ সংস্কারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সংলগ্ন খাল— ময়না নিউ কাট খালের ১০.৩০ কিমি, সবং-এর খাল সমূহের ৯০.৩৬২ কিমি ও পটাশপুর ও ভগবানপুরের খাল সমূহের ৬৯.৮০ কিমি সংস্কারের কর্মসূচি এই প্রকল্পে রয়েছে।

প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়াতে ইতিমধ্যে বেশকিছু নদী ও খালসমূহ প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জলবহন ও ধারন ক্ষমতা। নদী ও খালসমূহের পুনঃখনন করার সময় যে পর্যাপ্ত মাটি পাওয়া গেছে তা ব্যবহার করে দুধারের বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাঁধের দৃঢ়করণ করা হয়েছে। খননের বিপুল পরিমাণে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে নতুন রাস্তা-ঘাট তৈরিতে, ব্যবহার করা হয়েছে পুরনো রাস্তাঘাট চওড়া ও উঁচু করার কাজে, গ্রামের স্কুলের সংলগ্ন জমি উঁচু করা, গ্রামের খেলার মাঠ তৈরি করার কাজে, ধর্মীয় স্থানের কাজে, বসতবাড়ির জমি উঁচু করা-সহ আরো নানান কাজে। এই কাজ করার ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি বর্ষার জল সঠিক ভাবে প্রবাহের জন্য পূর্বে এই সকল নদীর সংলগ্ন যে-সব এলাকা জলমগ্ন হত সেইসব এলাকাতে বর্ষার সময় চাষবাস করা সম্ভব হয়েছে। এখনো পোক্তপোল রেলওয়ে ব্রিজ থেকে পাহাড়পুর পর্যন্ত কেলেঘাই নদীর সংস্কারের কাজ চলছে। যে এলাকার সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে সেইসব এলাকার মানুষ ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করেছে। প্রকল্প রূপায়ণে এলাকার জনগণের থেকে ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া গেছে। এবং এর সুদূরপ্রসারী সুফলের বিষয় জনগণ ইতিমধ্যে অনুধাবন করছেন। এলাকার পূর্বের নদী ও খালের অবস্থান ও সংস্কারের পরে তার সুফলের বিষয়ে স্থানীয় জনগণ ভীষণভাবে আশান্বিত। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিমটি সম্পূর্ণ রূপায়ণ হলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং, নারায়ণগড়, পিংলা, দাঁতন-১, কেশিয়াড়ি, সাঁকরাইল, খড়্গপুর-২, ডেবরা ব্লক এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না, পটাশপুর, ভগবানপুর ব্লকের জলনিকাশি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হবে এবং এলাকার বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। যেসব নিচু এলাকা জলমগ্ন হত সেইসব এলাকাতে চাষবাস করতে পারবে এলাকার চাষিরা। যাতায়াতের পথও উন্নত হবে। আশা করা যায় প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে অদূর ভবিষ্যতে দুই জেলার এই সকল এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে উন্নত হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে কান্দী মাস্টার প্ল্যান

প্রিয়ম গোস্বামী (নির্বাহী বাস্তুকার)

ভূমিপুত্র প্রবীর চক্রবর্তীর লেখা 'হিজল পাড়ে' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'আশ্বিন মাসে আকাশ ফাঁসে।
নিম্ন চাপে বাতাস কাঁপে।
বিহার জুড়ে বৃষ্টি ঝরে,
জলের ধারা পাগল পারা।
পাহাড় বেয়ে আসছে বেয়ে,
ম্যাসানজোড়ে জলের তোড়ে,
তিল্পে পাড়া বাঁধনহারা
লাগামছাড়া জলের ধারা
আছড়ে পড়ে হিজল পাড়া;
আমরা ভাসি হিজলবাসী।
চোখের কোণে স্বপ্নত্রাণে,
আঁকড়ে ধরি আবার গড়ি
নতুন করা হিজল পাড়ে,
মনের দুঃখে স্বপ্নসুখে।'

নদীমাতৃক মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত বন্যাপ্রবণ কান্দী মহকুমার ক্ষেত্রসীমা ১১৯০ বর্গকিমি এবং মোট জনসংখ্যা ১২.০৫ লক্ষ। মহকুমা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাটিতে অনেকগুলি বিল, যেমন হিজল বিল (১৩০ বর্গকিমি), পাতন বিল, বিল বেলুন, লাঙল হাটা বিল, কারুল বিল ইত্যাদি অবস্থিত। মহকুমাটির আকৃতি অনেকটা পিরিচদানির (ডিশ) মতো।

মহকুমাটি ময়ূরাক্ষী নদী অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত এবং কূয়ে, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, বাঁশলুই নদী দ্বারা বেষ্টিত। এই নদীগুলি ব্যাতীত মহকুমাটিতে বিভিন্ন Spill Channel, যেমন মণিকর্ণিকা, কানামোর, ডাউকি, গম্ভীরার বাহিত জলরাশি বন্যার সময় বিপত্তি ঘটাইয়া থাকে। ময়ূরাক্ষী নদীর মূল উপনদী দ্বারকা-ব্রাহ্মণী, কোপাই এবং বক্রেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া হিজল বিলে পতিত হইয়াছে। হিজল বিল হইতে বাবলা নদীর উৎপত্তি হইয়া অবশেষে দুটি শাখা

নদী উত্তরাসন এবং বাবলা নদীর মাধ্যমে যথাক্রমে আলিকপুর এবং কল্যাণপুরের নিকট ভাগীরথী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে অজয় নদ সৃষ্ট হইয়া কল্যাণপুরের কিছুটা নিম্নে কবি কুমুদরঞ্জন মুল্লিকের বাড়ি বর্ধমান জেলার কোগ্রামে ভাগীরথী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অজয় নদে বর্ষায় বাহিত জলের পরিমাণ ৩.৫০ লক্ষ কিউসেক।

রাঢ় বঙ্গের নদীগুলিও ছোটোনাগপুরের মালভূমির বিভিন্ন অংশ হইতে সৃষ্ট। রাঢ় বঙ্গের ভূমিতলের নতি খাড়া হওয়ার দরুন এবং চাষের জমির চৌরসিকরণ হেতু অতি অল্প সময়ে নদীগুলির জলরাশি রাঢ় বঙ্গ হইতে কান্দী মহকুমার বিভিন্ন অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

রাঢ় বঙ্গের মাটি মোরাম তথা এঁটেল হওয়ার দরুন এবং অবাধে গাছ কাটার দরুন ভূপৃষ্ঠের উপরিস্তরের মাটির বালুরাশি নদীবক্ষে বাহিত হয়। ময়ূরাক্ষী নদীবক্ষে গত ৫৪ বছরে বালি জমা হইয়াছে আনুমানিক 0.786×10^6 ঘনমিটার এবং হিজল বিলে 1.90×10^6 ঘনমিটার হইতে 1.56×10^6 ঘনমিটার। ফলস্বরূপ নদীগুলির নাব্যতা দিনের পর দিন হ্রাস হইতেছে। ফলত অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত নদীগুলির জলস্ফীতি ঘটাইতেছে এবং জমিদারি আমলে নির্মিত দুই পাড়ের নদীবাঁধগুলির জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে কান্দী ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে বর্ষায় প্লাবিত করিতেছে। এমতাবস্থায় এলাকার মানুষ দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করেন। প্রত্যেক বছরে গড়ে প্রায় ৯৭.৫৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এলাকার ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং বন্যাকবলিত মানুষজনের উদ্ধার কার্য অত্যন্ত দুর্বিষহ এবং বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়ে।

এরূপ অবর্ণনীয় অবস্থার পরিবর্তন করবার লক্ষ্যে প্রায় সত্তরের দশকে সেচ দপ্তরের মাধ্যমে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার পর বর্তমানে এই প্রকল্পটির আওতায় সর্বেক্ষণ, বন্যার কারণ অনুসন্ধান ও

প্রতিকার হেতু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এবং গাণিতিক মডেলিং-এর উপর ভিত্তি করিয়া সময়োপযোগী এবং সুপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশি ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন কার্যবিধি গৃহীত হইয়াছে। যেমন—

(১) ময়ূরাক্ষী, বেলে, দ্বারকা, কানামোর, কুয়ে এবং বাবলা নদীর উপর অবস্থিত ২২৩ কিমি নদীবাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি ও মজবুতিকরণ।

(২) স্বরূপখালি (৮.৩০ কিমি), জীবন্তী (৯কিমি), বাঁকি (১৪.৩০ কিমি), এবং ঝুমঝুমখালি প্রভৃতি নিকাশি নালাগুলির মোট ৪০ কিমি দৈর্ঘ্যের পলি উত্তোলন ও সংস্কার।

(৩) ৫৭টি স্লুইস মেরামতিকরণ।

(৪) ১২টি সেতুর প্রস্থে বৃদ্ধিকরণ।

(৫) কুঁয়ে নদীর উপর সাবিত্রীনগরে, বেলে নদীর উপর আন্দুলিয়া এবং বাবলা নদীর উপর শ্রীকৃষ্ণপুর তিনটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

প্রকল্পটি ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে FMPতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় মূল্য ৪৩৮.৯৪ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে ধরা হইয়াছিল। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সেচ বিভাগের সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আশা করা যায় প্রকল্পটি সার্বিকভাবে ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে।

রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প

বিভাসচন্দ্র বর্মণ (উপ-অধিকর্তা) ও **সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়** (গবেষণা সহায়ক)

রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা নদী বিজ্ঞান মন্দির পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া জেলায় মোহনপুরে অবস্থিত। সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে এই রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে একটি স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থা তথা কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী রাজীব ব্যানার্জী ও বিভাগের প্রধান সচিবের অনুপ্রেরণায় ও সদর্থক প্রচেষ্টায় এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নদী গবেষণাকেন্দ্রে নতুন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ স্থাপনের বিষয়ে প্রাথমিক বিস্তারিত প্রকল্প খসড়া প্রস্তুত করার জন্য এডসিল, (EdCIL) এডুকেশনাল কনসালটেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত সরকারের অধীনস্থ স্বশাসিত সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নদী বিজ্ঞান মন্দির (রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট), পশ্চিমবঙ্গে একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ নদী জলানুসন্ধান বিজ্ঞান (Hydrology), জল ও তদনুরূপ তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান (Hydraulics) এবং পরিসংখ্যান (Statistical) সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান নদী বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও মৌলিক তথ্য সংগ্রহ, ও তা লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বহমান বিভিন্ন নদ-নদী, সেচের খাল ও জল সংবহনের গতিবিধি নিরূপণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতবাদ দিয়ে থাকে। এই মতবাদ সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খসড়া প্রস্তুতিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেচ ও জলপথ বিভাগের ডাইরেক্টরেটের অধীনস্থ ও একজন মুখ্য বাস্তুকার (Chief Engineer) এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ১৯২০ সালে সেচ বিভাগ তৈরি হবার সময় এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিল। ততকালে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা এবং বিজ্ঞানী এস.সি. মজুমদার। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে নদিয়া জেলার মোহনপুরে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গবেষণাগারে জলগতি বিজ্ঞান, মৃদ বিকাশ বিজ্ঞান, রাশি তত্ত্বের অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রতিনিয়ত সংগঠিত হত। রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা কেন্দ্রে জলগতি বিজ্ঞানাগার, পলি ও মৃত্তিকা পরীক্ষাগার বর্তমান। তথ্য সংগ্রহর জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে সমগ্র বাংলাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নদীতে জলস্তর পরিমাপক মানদণ্ড (Gage Station) এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ যন্ত্রাদি স্থাপন করা আছে। বর্ধমান জেলায় গলসী মডেল স্টেশন, পুরুলিয়ার মানবাজার, দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়িতে, বীরভূম জেলায় ইলামবাজার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হাড়োয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দিঘাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নামখানায়, ইত্যাদি স্থানে নদী বিজ্ঞান মন্দির তার অধীনে থাকা পরিমাপের যন্ত্রাদি ব্যবহার করে ওই এলাকার নদীর জলস্তর ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও তা লিপিবদ্ধ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে অতীতে সেন্ট্রাল বোর্ড ইরিগেশন ও পাওয়ার (C.B.I.P), ভারত সরকারের দপ্তরের প্রস্তাবনায় বহু প্রাথমিক ও মৌলিক গবেষণার কাজ করা হয়েছে।

সেচ ও জলপথ দপ্তরে নদী বিজ্ঞান মন্দিরকে নতুন কলেবরে সাজানোর জন্য ও নদী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাস্তুকার তৈরি করার নিরিখে গত ০৮.০১.২০১৬ তারিখে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এডসিল (ইন্ডিয়া) সংস্থার সদর দপ্তর দিল্লিতে, ওই

সংস্থার প্রতিনিধি ও নদী বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিনিধি এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা হয় সেচ ও জলপথ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তুকাররা প্রথাগতভাবে নবনির্মিত কলেজে অধ্যয়ন করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও পরবর্তীতে ডক্টরাল ডিগ্রি লাভ করতে পারবেন। এডিসিল (ইন্ডিয়া) সংস্থা তাদের প্রাথমিক বিস্তারিত খসড়াতে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপনার জন্য অধিকর্তা, অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক প্রভৃতি পদে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। নদী বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান কর্মচারী ও আধিকারিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবগঠিত কলেজের বিভিন্ন পদসমূহতে নিযুক্ত করার প্রস্তাব খসড়াতে উল্লেখ থাকার জন্য আলোচনা হয়। বর্তমানে উপযুক্ত নদী বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি ও নদী বিজ্ঞানের উপর উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত ছাত্রের অভাব। তাই নদী বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠানে একটি কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে জলগতি ও জলসন্ধান সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ পঠন-পাঠনে নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বাস্তুকার তৈরি করার উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছে। নদী বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান গবেষণাগার ও পরীক্ষাগারগুলি, নবনির্মিত কলেজের পঠন-পাঠনের জন্য ছাত্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। এই উন্নতিসাধনের ফলে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি যেমন দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব লাভ করবে, তেমনি নদী বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বিশেষ পারদর্শী হয়ে পশ্চিমবাংলার নদ, নদী, সেচ ও জলপথ বিভাগের উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে ব্রতী হতে পারবে।

এখানে দুটি বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম সূচনা করার কথা আলোচনা হয়েছে, (১) রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং (২) হাইড্রোলজি এবং হাইড্রো ইনফরমেটিক্স। প্রতি পাঠ্যক্রমের জন্য ১৮ জন ছাত্রের পঠন-পাঠনে সুযোগ থাকবে। ১২ জন ছাত্র নিযুক্ত হবে সর্বভারতীয় GATE পরীক্ষার স্কোরের মাধ্যমে, ৩ জন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মনোনীত বাস্তুকার এবং ৩ জন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা অধিগৃহীত সংস্থার বাস্তুকারগণ। এই স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম শুরু হবার দুই বৎসর অতিবাহিত হবার পর যে সকল ছাত্র বা বাস্তুকারগণ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত হবেন, তাঁরা পরবর্তী সময়ে Ph.D. ডিগ্রিপ্রাপ্ত করার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও দপ্তরের অন্যান্য ইচ্ছুক যোগ্যতাসম্পন্ন বাস্তুকারগণও এই Ph.D. প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবেন, এই ডক্টরাল পাঠ্যক্রমের জন্য সর্বমোট ২৫টি আসন বরাদ্দ থাকার কথা আলোচনা হয়েছে। এই নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত হবার পর সর্বমোট ৯৭ জন ছাত্রকে প্রতিষ্ঠান পূর্ণ ক্ষমতায় ডিগ্রি প্রদানে প্রয়াসী হবে।

এছাড়াও নদী বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান (৯টি) গবেষণাগার ও পরীক্ষাগারগুলি আরো উন্নতমানের করা হবে, যাতে ছাত্রগণ ও নদী বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান আধিকারিকগণ ও কর্মীবৃন্দগণ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে দপ্তরকে সার্বিকভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

নবনির্মিত কলেজটি নিজ দপ্তরের ও অন্যান্য দপ্তরের বাস্তুকারদের কথা চিন্তা করে তাঁদেরকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের (১ থেকে ৪ সপ্তাহ) সুবন্দোবস্ত করার প্রয়াস নিয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ খুব তারাতারি শুরু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ১৪টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল MIKE-11 ও HEC-RAS Software চালিত গাণিতিক মডেলের প্রশিক্ষণ নেওয়া। এই নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানটি AICTE–এর অনুমোদন ও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটি শাখারূপে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সর্বমোট ৫ বছর সময় ধার্য করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ১৯৬.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে (Capital Cost) ১২৮.৮১৬ কোটি টাকা এবং রেকারিং কস্ট ৬৭.৪৫ কোটি টাকা।

এই প্রয়াস সফল হলে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের একটি নবনির্মিত কলেজকে কেন্দ্র করে এই এলাকারও বিশেষ উন্নতি হবে। এই অঞ্চলের অদূরেই বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, (IISER) আই.আই.আই.টি (IIIT) অবস্থিত। এই অঞ্চলটি অচিরেই একটি শিক্ষাকেন্দ্র (Educational Hub) হিসাবে পরিণত হবে।

'প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা ও তার প্রশমন'

দিলীপ কর্মকার (সহ-বাস্তুকার)

প্রকৃতির মাঝে আমাদের বাস। এই প্রকৃতির থেকে উপাদান গ্রহণ করেই আমাদের বাঁচা ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই উপাদানসমূহের সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফলে এই সুন্দর প্রকৃতি মাঝে মাঝে রুষ্ট হয় এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে থাকে। ঘটে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয় মোকাবিলাতে ভারত সরকার ২০০৫ সালে বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট (Disaster Management Act, 2005) আইন প্রণয়ন করে। একই সময়ে জাতীয় বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সংস্থা [National Disaster Management Authority (NDMA)] তৈরি হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয় মোকাবিলাতে সঠিক কী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তার পরিকল্পনা করা ও রূপায়ণে সাহায্য করা এই সংস্থার কাজ। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিগত সময়ে বিপর্যয়সমূহের পরিসংখ্যান ও বর্তমান পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে কী ধরনের মোকাবিলার প্রয়োজন তার রূপরেখা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকাও গ্রহণ করে থাকে জাতীয় বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট অথরিটি।

আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে। খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি। এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভর করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা কোনভাবেই মানব সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল বিপর্যয়কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করা ও বিপর্যয়ে জীবনহানি, সম্পত্তির ক্ষতি, গৃহপালিত পশুর জীবনহানি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব। অর্থাৎ বিপর্যয়ের জন্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমানো যেতে পারে। এমনকি আগাম উপযুক্ত পরিকল্পনা ও স্বয়ংক্রিয় প্রচারের সাথে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো যেতে পারে। এই বিষয়ে জাতীয় বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সংস্থা বেশ কিছু সুপারিশ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। পূর্বে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ের বিষয় উল্লেখ করলেও এখানে মূলত বন্যাজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বন্যা আমাদের দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ভারতবর্ষ ভূখণ্ডের প্রায় ৫৯ শতাংশ এলাকা বন্যাকবলিত এলাকা বলে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। বন্যার ফলে বহু জীবনহানি সহ পশুপাখির জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ঘটে থাকে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বন্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে ১৯৭৮ সালে। ওই সময়ে বন্যাতে দেশে ১১,৩১৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। ঘটেছে বহু পশুপাখির প্রাণহানি। এছাড়া বহু সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই বন্যাতে।

আমাদের দেশে বন্যার প্রতিকার ও জনগণের কিছুটা কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে জাতীয় বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সংস্থা বেশ কিছু প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছে।

(০.১) যে সমস্ত এলাকাতে বন্যা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বা ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘটেছে বা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, সেই সকল এলাকাতে বসবাসের বাড়িঘর নির্মাণের সময় বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ করা।

(০.২) এলাকাতে জনগণের ব্যবহারের জন্য এমন কিছু স্ট্রাকচার বা অট্টালিকা বিশেষভাবে নির্মাণ করতে হবে, যা বন্যার সময় কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এইরকম এলাকাতে কয়েকটি স্ট্রাকচার নির্মাণ করলে, প্রয়োজনে বন্যার সময় অর্থাৎ জরুরি সংকটের সময় জনগণ ওই স্থানে সাময়িকভাবে থাকার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

(০.৩) বন্যার সময় এলাকার মানুষ তাদের নিজেদের কিভাবে বাঁচাবে এবং পরিবার-পরিজন সহ গৃহপালিত পশুপক্ষীদেরও কিভাবে বাঁচাবে, সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত করে সচেতন করা। সংকটের সময় নিজেকে ও সকলকে বাঁচাবার সময় যে সকল জিনিসপত্তর ব্যবহার করা হবে সেই সকল জিনিসপত্তরের সাথে জনগণকে পরিচয় করানো।

(০.৪) বন্যার সময় জরুরিভিত্তিক জনগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক বেশ কিছু কর্মীকে ট্রেনিং প্রদান

করে প্রস্তুত করে রাখা ও এই ট্রেনিং এলাকার জনগণকে দেওয়া।

(০.৫) বন্যার শেষে জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়টি বিশেষভাবে দেখভালের জন্য ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিশেষ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক বেশ কিছু কর্মীকে ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করে রাখা ইত্যাদি।

মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যার সময় যতটা সম্ভব প্রতিহত করার বিভিন্ন প্রকার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। এলাকায় ইতিপূর্বে বন্যার অভিজ্ঞতা ও সেই সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কর্মসাধন হয়েছিল তার নিরিখে কাজের পরিকল্পনা করা ও ধারাবাহিকভাবে এই কর্মকাণ্ডর সাথে যুক্ত থাকতে হবে।

ভারতবর্ষকে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চারটি এলাকাতে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল

(খ) গঙ্গা অঞ্চল

(গ) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল

(ঘ) মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল

ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল— নির্দেশ করে ব্রহ্মপুত্র নদ ও বরাক নদী, সাথে তাদের শাখা-প্রশাখা নদীসমূহ বেষ্টিত অঞ্চলসমূহ। সাধারণত এই এলাকা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে নির্দেশ করে। অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর অংশের কিছু এলাকা নির্দেশ করে। **গঙ্গা অঞ্চল** নির্দেশ করে গঙ্গা নদী ও তার উল্লেখযোগ্য শাখা নদী যমুনা, শোন, ঘাগরা, গনডাক, কোশি, মহানন্দা ইত্যাদি নদীসমূহ ও এসব নদীর প্রশাখা নদীসমূহ বেষ্টিত অঞ্চলসমূহ। এই গঙ্গা অঞ্চল বিস্তৃত বিভিন্ন প্রদেশে। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের, হরিয়ানার কিয়ৎ অংশ, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লি রাজ্যসমূহে গঙ্গা অঞ্চল বিস্তৃত। **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল** চিহ্নিত হয়েছে সুতলেজ, বিয়াস, রবি নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা নদীসমূহ বেষ্টিত অঞ্চলসমূহ। এই নদীসমূহের জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশের কিছুটা অংশ, হরিয়ানা ও রাজস্থান রাজ্যে অবস্থান। শেষ বন্যাপ্রবণ অঞ্চল অর্থাৎ **মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলও** নির্দেশ করে বিভিন্ন নদীসমূহ ও তাদের শাখা-প্রশাখা নদীসমূহের এলাকা। নদীগুলির মধ্যে আছে নর্মদা, তাপ্তি, মহানন্দা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি নদীসমূহ। এসকল নদী অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এছাড়া ওড়িশা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এছাড়া ওড়িশা রাজ্যে প্রবাহিত ব্রাহ্মণী নদী ও সুবর্ণরেখা নদীর এলাকাও এই মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থান।

আমাদের রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপ্রবণ অঞ্চল মূলতঃ ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল ও গঙ্গা অঞ্চলের আয়ত্তাধীন। পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার বেশ কিছু বন্যাপ্রবণ এলাকা এযাবৎকাল চিহ্নিত হয়েছে, যা সারণি-০১ দেখানো হল।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বন্যাপ্রবণ এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	(বর্গ কিমি হিসেবে)	
		ভৌগলিক এলাকা	বন্যাপ্রবণ এলাকা
০১	দার্জিলিং	৩,১৮৯	১২৭
০২	কোচবিহার	৩,৩৮৭	২,০০০
০৩	জলপাইগুড়ি	৬,২২৭	৩,০০০
০৪	উত্তর দিনাজপুর	৫,৩৫৮	৩,৪৫৮
০৫	দক্ষিণ দিনাজপুর		১,০০০
০৬	মালদহ	৩,৭৩৩	৩,০০০
০৭	মুর্শিদাবাদ	৫,৩২৪	২,৮৫৮
০৮	বীরভূম	৪,৫৪৫	৩,১৮২
০৯	বাঁকুড়া	৬,৮৮২	১১৮
১০	হুগলি	৩,১৪৯	৯১২
১১	হাওড়া	১,৪৬৭	৬০০

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	(বর্গ কিমি হিসেবে)	
		ভৌগলিক এলাকা	বন্যাপ্রবণ এলাকা
১২	পূর্ব মেদিনীপুর	১৪,০৮১	৬,৮২৩
১৩	পশ্চিম মেদিনীপুর		
১৪	বর্ধমান	৭,০২৪	২,৪৫৮
১৫	নদিয়া	৩,৯২৭	৩,৭৩১
১৬	পুরুলিয়া	৬,২৫৯	৬৫
১৭	২৪ পরগনা (উত্তর)	১৪,১৩৬	৬,৪২৮
১৮	২৪ পরগনা (দক্ষিণ)		
১৯	কলকাতা (কর্পোরেশন) এলাকা	১০৪	নেই
	মোটঃ	৮৮,৭৫২	৩৭,৭৬০

মূলত ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা ও তার শাখা নদীসমূহের অববাহিকা এবং গঙ্গানদী ও তার শাখা নদীগুলির অববাহিকাই এই রাজ্যের বন্যাপ্রবণ এলাকা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা। এই নদ ও তার শাখা নদীসমূহে জলগ্রহণক্ষেত্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১০ সেমি থেকে ৬৩৫ সেমি পর্যন্ত। সাধারণত বছরের মে/জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই জলগ্রহক্ষেত্রের জল নদী অববাহিকা বহন করার সময় নদীর তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয় হয় নদীর তীর ও নদীর দুই ধারের বাঁধ। ক্রমে বাঁধ দুর্বল হয়ে ভেঙে যায় ও নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা জলমগ্ন হয়। যেহেতু এই নদী সকলের উৎসস্থল পাহাড়ে, তাই জলপ্রবাহের গতি তীব্রতার কারণে বিশাল পরিমাণের জলরাশি বহন করতে গিয়ে অববাহিকার ধারন ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়। ফলে মাঝে মাঝে অববাহিকা তার স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করে বন্যার সৃষ্টি করে। বিগত বছরগুলিতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র নদ ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীসমূহ যেমন তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, মহানন্দা ইত্যাদি নদীর জলপ্রবাহের জন্য উত্তরবঙ্গে প্রায় প্রতিবছরে বন্যা হয়ে থাকে। এবং এক বিশাল অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সকল নদীর উৎসস্থল পাহাড়ে, তাই প্রবাহের সময় বহু পলি বহন করে নিয়ে আসে ও নদীর তলদেশে জমা হয়ে নদীর নাব্যতা হ্রাস করে, ফলে নদীর ধারণক্ষমতা কম হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গঙ্গা অববাহিকার উৎসস্থল উত্তরাখণ্ড রাজ্যে এবং শেষাংশ আমাদের রাজ্য হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত মহানন্দা, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদি নদীসমূহ গঙ্গা অববাহিকার শাখানদী। গঙ্গা অববাহিকা বহু পলি বহন করে তার শেষাংশ পর্যন্ত নিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। ফলে এই নদী ও শাখা নদীসমূহের অপর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা এবং জোয়ারভাঁটার কারণে এই নদীসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বন্যা হয়ে থাকে। এই সকল নদীর তীর ভাঙন, তলদেশের ক্ষয়ও বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন কারণে বন্যা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হয়ে থাকে। পাহাড়ের সমতলে আকস্মিক বন্যা (flash flood) হয়। নিকাশি খালে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে এলাকাতে জলমগ্ন হয়ে বন্যার রূপ নেয়। জলস্ফীতির ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বন্যা হয়ে থাকে। একনাগাড়ে বেশি সময়ের বৃষ্টির জল খাল, বিল, নদীনালার মাধ্যমে সময়ে প্রবাহিত হতে না পারার কারণে বন্যা হয়ে থাকে। আকস্মিক বন্যা সাধারণত পাহাড় এলাকাতে হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে হিমালয় থেকে উৎপত্তি যে সকল নদীর সাধারণত তা আপন গতিতে বইতে থাকে পাহাড় থেকে সমতলে। হঠাৎ কোনো কারণে এক বিশাল পরিমাণের জলরাশি অববাহিকাতে পাহাড় থেকে নেমে এলে অববাহিকার ধারণক্ষমতার অপ্রতুলতার কারণে দুই পাহাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে। শহর এলাকার যে সকল নিকাশি খালের বর্জ্য জল নদীতে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে, সেই নদী জোয়ার-ভাঁটার নদী হলে ও তার নাব্যতা কম হলে বর্জ্য জল নিষ্কাশনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র। সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার কারণে জলতলের উচ্চতা বাড়ে ও কমে। অতিরিক্ত জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ও সাইক্লোনিক আবহাওয়াতে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হলে সমুদ্রের সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকে।

এককথায় বলতে গেলে বলা যায় নদীর ভাঙন, স্বল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, উপায়ন্তরে জলাধার থেকে জল ছাড়া, নদীতে পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, ভরা জোয়ারে সাইক্লোনিক আবহাওয়ায় জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হলে,

ভূমিক্ষয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের নানাবিধ সমন্বয়ে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক নদীর সীমানার বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নানান কারণে নদীর তল, নদীর বাঁধ ও নদীর তীরের ভাঙন হয়, ফলে অববাহিকার প্রবাহিত জল পার্শ্ববর্তী এলাকাতে ঢুকে বন্যার সৃষ্টি করে। কোনো এলাকাতে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জল অববাহিকাতে ধারণ করতে না পারলে বন্যা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নদীই হিমালয় থেকে উৎপত্তি, ফলে বহু পরিমাণে পলিমাটি ওই সকল নদী বহন করে নিয়ে আসে। এই পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে যায় ও জলধারণ ক্ষমতা কমে আসে। ফলে অতিরিক্ত জলে অববাহিকাতে এলেই বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত নিম্নচাপের প্রভাবে সাইক্লোন আবহাওয়ার দরুন বৃষ্টিপাত সহ জলোচ্ছ্বাসের কারণেও বন্যা হয়ে থাকে। এই সকল পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতেই হয়। রাজ্যের উত্তরে হিমালয়ে বহু ছোট-বড় প্রাকৃতিক জালাধার বর্তমান। এখানে ভৌগোলিক কারণে মাটির চরিত্রে মাঝে মাঝে ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে। হঠাৎ ওই প্রকৃতির জলাধারের সংলগ্ন ভূমিক্ষয় হলে ওই বিশাল পরিমাণের জল একসাথে অববাহিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হতেই বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়—বন্যার কারণের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ন (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) একটি অন্যতম কারণ। ছয় ঋতু পশ্চিমবাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু। কিন্তু আবহাওয়াবিদেরা তাদের সুবিধার্থে পুরো বছরকে চারটি ঋতুতে ভাগ করেছেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা (Moonsoon), শরৎ (Post Moonsoon) এবং শীত। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৯৮ সাল থেকে ক্রমে তাপমাত্র বাড়ছে। কলকাতার আবহাওয়া অফিসের হিসেব অনুযায়ী ও এযাবৎ কাল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯২৪ সালে ১ মে। সেদিনের তাপমাত্রা ছিল ৪৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা সারণি–২ দেখান হল।

সাল	তারিখ	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াস
১৯৯৮	১১ এপ্রিল	৩৭.৮
১৯৯৯	১৫ এপ্রিল	৩৮.৪
২০০০	১০ এপ্রিল	৩৮.৪
২০০১	২৩ এপ্রিল	৩৮.৯
২০০২	৮ এপ্রিল	৩৭.০
২০০৩	২৫ এপ্রিল	৩৭.১
২০০৪	১৭ এপ্রিল	৩৭.৯
২০০৫	২৭ এপ্রিল	৩৮.৭
২০০৬	৩০ এপ্রিল	৩৮.৮
২০০৭	২৩ এপ্রিল	৩৮.৪
২০০৮	১১ এপ্রিল	৩৯.০
২০০৯	১৯ এপ্রিল	৪১.২
২০১০	১৭ এপ্রিল	৪০.৬
২০১১	১০ মে	৩৭.৮
২০১২	৪ জুন	৪১.১
২০১৩	৯ এপ্রিল	৪০.০
২০১৪	২৫ মে	৪১.১
২০১৫	২৫ মে	৩৭.১
২০১৬	১৮ এপ্রিল	৪৩.০

উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে সাধারনভাবে বলা যায় মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রকৃতি থেকে নানান ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে যে সকল গ্যাস উৎপন্ন হয় তার প্রতিক্রিয়া। উৎপন্ন গ্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ইথেন, মিথেন ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে বাতাসে বেড়ে যাওয়ায়। অন্যদিকে নির্বিচারে অরণ্য ভূমি ও জলাভূমি ধ্বংস করা। আছে অপরিকল্পিতভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। বিশেষভাবে বন-জঙ্গল ধ্বংস বা অরণ্য ধ্বংস করা ও শিল্পজাত বিষাক্ত বর্জ্য বা নিত্যব্যবহার্য বর্জ্য সহ ক্ষয়হীন লয়হীন প্লাসটিকজাত দ্রব্যাদি প্রতিদিন সরাসরি নদীনালা, খালবিলে ও সমুদ্রে ফেলা ইত্যাদি। লক্ষ করা গেছে, মিথেন ও জলীয় বাষ্পের বিরাট ভূমিকা আছে এই উষ্ণায়নে। আর এই উষ্ণায়নের ফলে যেমন পৃথিবীর সুমেরুর সুবিশাল বরফের চাঙড় গলছে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের হিমবাহ, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় পর্বতের হিমবাহও গলছে। এই হিমবাহ গলে উৎপন্ন জল হিমালয় থেকে উৎস বিভিন্ন নদী ও তার শাখা নদীসমূহের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে সমতলে এসে, শেষে সমুদ্রে মিশেছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সাথে অতিরিক্ত হিমবাহ গলে উৎপন্ন জল একই সাথে অববাহিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহের ফলে বন্যার রূপ ধারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

রাজ্যের বন্যার প্রকোপ কম করার লক্ষ্যে সেচ ও জলপথ বিভাগ আগাম প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। প্রতিবছর বর্ষার প্রাক্‌কালে সেচ ও জলপথ বিভাগের আধিকারিকদের পূর্বতন বন্যা মোকাবিলার অভিজ্ঞতার নিরিখে আগাম পরিকল্পনা করে থাকে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মালপত্তর সংগ্রহ করে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জল হঠাৎ জলাধারগুলিতে যাওয়ার ফলে, জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই জল ছাড়ার সংবাদ পূর্বেই সংগ্রহ এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তথ্য, বিভিন্ন নদীতে জলপ্রবাহের লেভেল ইত্যাদি সংগ্রহ ও তা প্রতিদিন প্রসাশনের কাছে পাঠাবার জন্য সেচ ও জলপথ বিভাগে খোলা হয়ে থাকে কন্ট্রোলরুম। এই কন্ট্রোলরুম বিধাননগরের জলসম্পদ ভবনে বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হত। বর্তমান সরকারের সময়ে জনগণের সুবিধার জন্য অহরাত্রি খোলার ব্যবস্থা করা হয়। এই কন্ট্রোল রুমের ফোন নং—২৩২১-৮৩৪১। তাৎক্ষণিক বন্যা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় জনগণ ফোন করে জেনে নিতে পারেন। এছাড়া বিধাননগরের কেন্দ্রীয় অফিসে দক্ষিণবঙ্গের জন্য ও উত্তরবঙ্গের জন্য জলপাইগুড়ি ক্লাব রোডে অবস্থিত মুখ্য বাস্তুকারের অফিসে খোলা হয়ে থাকে ২টি টোলফ্রি টেলিফোন। (বিধাননগরে— ১৮০০৩৪৫০১১৭ এবং জলপাইগুড়ি ক্লাব রোডে— ১৮০০৩৪৫৩২৫৫) যার মাধ্যমে জনগণ বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবে। তাছাড়াও সেচ ও জলপথ দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বন্যা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য রিয়্যালটাইমে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য বর্ষার প্রাক্‌কালে সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে প্রতি বছর বন্যার কাজে যুক্ত থাকা রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত করে থাকে। ওই মিটিংয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিষয়ে সুনিশ্চিত মতামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকেন। বন্যার সময় দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় ও কার্যপদ্ধতির রূপরেখা তৈরি করা হয়ে থাকে। জলাধার ও ব্যারেজ থেকে বেরোনো জলে যে সকল নিচু এলাকা জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল এলাকার স্থানীয় প্রশাসনকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত আগাম জানিয়ে দেবার কাজটি সেচ ও জলপথ বিভাগ প্রতি বছর করে থাকে। যার ফলে প্রসাশনের তরফে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাণহানি বা সম্পত্তিহানি রোধ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বন্যার কারণে বিভিন্ন নদীবাঁধ ও ক্যানেল বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে এবং তার ফলে সংলগ্ন গ্রামে জল ঢোকে। তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিহত

করার জন্য প্রতি বছর বন্যার পূর্বে সম্ভাব্য এলাকাতে সেচ ও জলপথ বিভাগের বিভিন্ন অফিসে মজুত করা হয়ে থাকে বাঁশ, বল্লা, সিমেন্টের খালি বস্তা, তার জালের চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বস্তু ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যায় ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামতি করা হয়ে থাকে। জল ছাড়ার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকাতে সেচ ও জলপথ বিভাগের আধিকারিক সহ কর্মিবৃন্দ দিবারাত্রি নজরদারিতে রাখে জলপ্রবাহের গতিবিধি, বাঁধের অবস্থা ইত্যাদি। যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্কারের কাজ করা সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্যা পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই বিপর্যয়ের তীব্রতা প্রতিহত করা যেতে পারে। জনগণকে আগাম সতর্কতা বার্তা দিয়ে ও বেশ কিছু প্রতিকারের পদ্ধতি অবলম্বনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশ কমানো যেতে পারে। কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে ও কোন পদ্ধতি ওই সময়ে অবলম্বন করতে হবে, তার একটি নির্দেশিকা উল্লেখ করেছে **জাতীয় বিপর্যয় ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সংস্থা**।

(১) আগাম জনগণকে সতর্ক করা (প্রয়োজনে বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি ব্যবহার করে)।

(২) বন্যার পূর্বাভাস প্রচারের পূর্বে ও ঘটে যাবার পর জনগণকে কীকী করতে হবে এবং কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তা জনগণকে অবিহিত করা। প্রয়োজনে পুস্তিকা বিলি করে তাদের অবহিত করা।

(৩) এলাকাভিত্তিক উঁচু স্থানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিকাঠামো নির্মাণ করা। প্রয়োজনে ওই স্থানে সময়ে জনগণকে স্থানান্তরিত করা যায়।

(৪) তাৎক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ রাখা (বিশেষ করে স্থানীয় ও সহজলভ্য ব্যবহারযোগ্য উপাদানসমূহ)।

(৫) জনগণকে সঠিক স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যান ও এলাকাভিত্তিক কিছু কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখা।

(৬) জনগণকে ওই সময় বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার, পানীয় জল, ঔষধপত্তর ইত্যাদি জোগান পূর্বেই ঠিক রাখা।

সর্বোপরি বলা যায় মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে চলেছে যুগ যুগ ধরে। বিজ্ঞানের ব্যবহারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। তথাপি বন্যা নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তা লঘু করার লক্ষ্যে পূর্বে উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এবিষয়ে জনসচেতনতা গড়া ও বন্যার প্রাক্মুহূর্তে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে সঠিকভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে বন্যার ব্যপকতা ও তীব্রতাতে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতি থেকে জনগণ অনেকটাই রেহাই পাবেন। এই বিষয়ে যেমন প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ থাকবে, তেমনি বন্যাপীড়িত এলাকার জনগণকে সচেতন হয়ে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। গ্রাম্য এলাকায় বন্যার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর সঙ্গে স্থানীয় সেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ বন্যা মোকাবিলাতে জরুরিভিত্তিক যে সকল সংস্থা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয়, একযোগে বন্যা মোকাবিলা ও প্রকোপ উপশমের কাজে বিশেষ সুফল প্রদান করবে। মনে রাখতে হবে এই কাজে শুধু বন্যার সময়েই নয়, বছরের অন্যান্য সময়েও প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে বন্যা প্রতিকারে অগ্রিম যে সকল কার্যক্রম থাকে, তা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে সভ্যতার অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সবুজ অরণ্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

সূত্র : National Disaster Management Guidelines & Reports of Irrigation & Waterwayas Deptt.

উন্নয়নের আর এক ধাপ সুন্দরবনের চেমাগুড়ি ফুলডুবি খালের উপর দশ কপাটযুক্ত স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ

অমিয় চক্রবর্তী (সহ-বাস্তুকার)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাগর ব্লকে চেমাগুড়ি ফুলডুবি খালের উপর দশ কপাটযুক্ত স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। জেলার তথা রাজ্যের শেষ সীমানায় সাগর দ্বীপে অবস্থিত এই খালটি। প্রায় দেড় বছর ধরে কর্মযজ্ঞ চলছে ওই স্থানে। এই স্লুইস গেটটির নির্মাণ স্থান মুড়িগঙ্গা নদীর থেকে প্রায় তিন কিমি উজানে চেমাগুড়ি ফুলডুবি খালের উপরে। এই খাল, সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার নিকাশির কাজ করে। একটি বিশাল এলাকার বৃষ্টির জল ও এলাকার বর্জ্যজল এই খাল মারফত নিষ্কাশিত হয়ে মুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়ে। সুন্দরবনের এই এলাকাতে মিঠা জলের ভীষণ অভাব। ফলে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ন এলাকার চাষবাসের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া এই এলাকাতে কোনও স্লুইস গেট নেই, ফলে দীর্ঘদিনের এলাকাবাসীর চাহিদাক্রমে এবং বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় ও সেচ ও জলপথ বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দশ ভেন্ট স্লুইস গেটটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হতে চলেছে। দীর্ঘ দেড় বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এই বিশাল নির্মাণকার্য চলছে। আশা করা যায়, আর কয়েক মাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। এই কাজ সম্পন্ন হলে এই খালে মিঠা জলের ভাণ্ডার তৈরি হবে। যেহেতু সুন্দরবন এলাকার নিকাশি খাল, তাই সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি হলে অনেক সময় নোনা জল এই ফুলডুবি খালে ঢুকে পড়ে। স্লুইস গেটটি নির্মাণের ফলে এই জল খালের ভিতরে ঢোকা যেমন আটকানো যাবে, তেমনি খালে ধরে রাখা মিঠা জল এলাকাতে খালের সংলগ্ন চাষের জমিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। স্লুইস গেটটি নিয়ন্ত্রণ করে এলাকার অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করা ও নোনা জল খালে ঢোকা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই গেটটি তৈরি করা হয়েছে। গেটটি নিয়ন্ত্রণ করে মিষ্টি জলের ভাণ্ডার তৈরি করা হবে। নির্মাণকাজ শেষ হলে চিমাগুড়ি, মনসাদ্বীপ, বঙ্কিমনগর, সুমতিনগর, কমলপুর, হারাধনপুর, খানসাহেব আবাদ, মহেন্দ্রগঞ্জ ইত্যাদি ১০টি মৌজার প্রায় ২৫০০ হেক্টর জমিতে ওই খালের মিষ্টি জল ব্যবহার করে সেচের কাজ করা সম্ভব হবে। খলের দূরবর্তী এলাকাতেও পাম্পের সাহায্যে খালের জল পাঠিয়ে চাষের কাজ করা সহজ হবে। ফলে ওই এলাকার চাষিরা উপকৃত হবেন। এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের জন্য গেটের উপরিভাগে যে রাস্তা তৈরি হবে, তা ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে এলাকার অনেক প্রত্যন্ত স্থানে যাতায়াত সহজ হবে। স্লুইস গেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

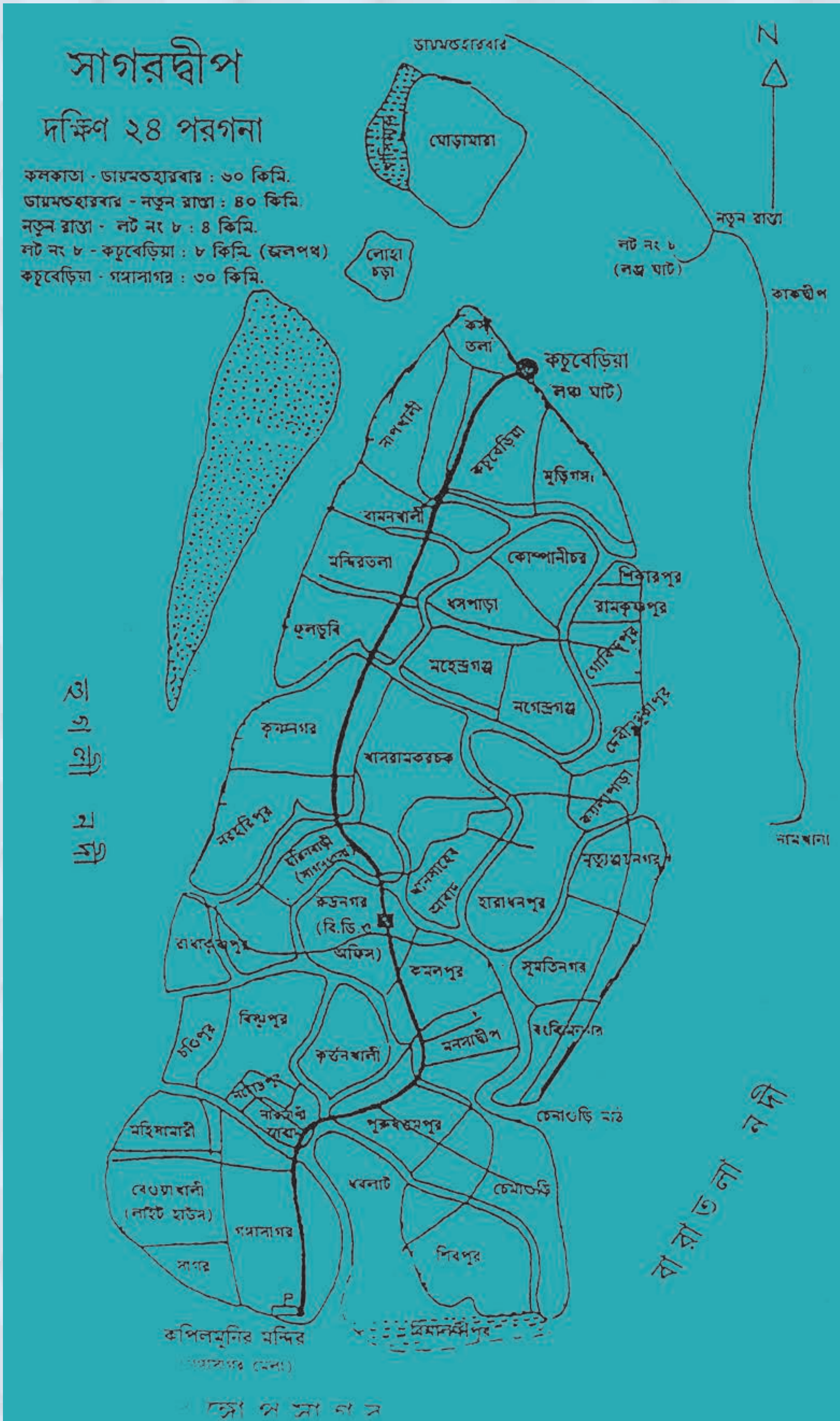

সাগরদ্বীপ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ডায়মণ্ডহারবার : ৬০ কিমি.
ডায়মণ্ডহারবার - নতুন রাস্তা : ৪০ কিমি.
নতুন রাস্তা - লট নং ৮ : ৪ কিমি.
লট নং ৮ - কচুবেড়িয়া : ৮ কিমি. (জলপথ)
কচুবেড়িয়া - গঙ্গাসাগর : ৩০ কিমি.
N
ডায়মণ্ডহারবার
ঘোড়ামারা
লোহাচড়া
নতুন রাস্তা
লট নং ৮
(লঞ্চ ঘাট)
কাকদ্বীপ
কচুবেড়িয়া
(লঞ্চ ঘাট)
মুড়িগঙ্গা
বামনখালী
মন্দিরতলা
কোম্পানীচর
শিকারপুর
রামকৃষ্ণপুর
ধসপাড়া
ফুলবাড়ি
মহেন্দ্রগঞ্জ
নগেন্দ্রগঞ্জ
কৃষ্ণনগর
খাসরামকরচক
নামখানা
হারাধনপুর
কমলপুর
সুমতিনগর
কীর্তনখালী
মনসাদ্বীপ
চেমাগুড়ি নদী
পুরুষোত্তমপুর
মহিষামারী
বেগুয়াখালী
(লাইট হাউস)
ধবলাট
চেমাগুড়ি
গঙ্গাসাগর
শিবপুর
সাগর
কপিলমুনির মন্দির
বড়তলা নদী

স্লুইস গেটটি তৈরির পর সংলগ্ন যে জলাধার তৈরি হবে তার আয়তন ১৯১ হেক্টর মিটার। কপাটের সংখ্যা ১০টি যার সাইজ (২.৭০×২.২০) মিটার। স্ট্রাকচারের প্রস্থ ৪৪.৫৫ মিটার, স্ট্রাকচারের উপরিভাগে যে রাস্তা তৈরি হবে তার লেভেল ৫.৭০ মিটার। ক্যারিজ ওয়ের লেভেল ৪.২৫ মিটার। সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারটি ৫৯৪টি স্টোন কলাম ও শিট পাইলের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে ১০ কপাটযুক্ত স্লুইস গেটটি নির্মাণের পর জনসাধারণের জন্য খুলে দিলে সুন্দরবনের প্রায় ১০টি মৌজায় দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে। খাল সংস্কারের কাজ হলে এলাকার মানুষের চাষবাসের সমস্যার বেশকিছুটা লাঘব হবে। আগামী দিনে এই স্লুইস গেটটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকাবাসীর নজরদারি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সুবারবার্ন হেডকাট চ্যানেলের উপর কলকাতা পৌরনিগমের এলাকার অন্তর্গত চৌবাগা বাজারে দুই লেনবিশিষ্ট পাকা সেতুর শুভ উদ্বোধন

গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও কসবা কেন্দ্রের বিধায়ক জনাব জাভেদ আহমেদ খান মহাশয়ের আন্তরিক উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী রাজীব ব্যানার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও তদারকিতে কলকাতার পৌর এলাকার চৌবাগায় সুবারবার্ন হেডকাট চ্যানেলের উপর নবনির্মিত পাকা সেতুটির উদ্বোধন হল। এলাকার জনগণের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই নবনির্মিত সেতুটির উদ্বোধন করলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব ব্যানার্জীর সহ এলাকার মাননীয় সাংসদ শ্রী সুব্রত বক্সী, মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমেদ খান, অসামরিক প্রতিরক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ, অগ্নিনির্বাপণ ও আপৎকালীন সেবা এবং আবাসন বিভাগ। এলাকার গুণীজন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এই পাকা সেতুটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হল, চৌবাগা বাজার সংলগ্ন মাঠের সভাতে। এখানে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সেচ ও জলপথ বিভাগের আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণও উপস্থিত ছিলেন। এই সেতুটি নির্মাণ করা হয় কলকাতা জেলার পৌর নিগমের ১০৮ নং ওয়ার্ডে সুবারবার্ন হেডকাট

চ্যানেলের ১৬৩.০০ চেনেজে। এই স্থান তিলজলা থানার অধীনে চৌবাগা বাজার সংলগ্ন এলাকা। দুইলেন বিশিষ্ট পাকা সেতুটির দৈর্ঘ্য ৪২ মিটার। ফুটপাত সহ দুই লেনের পাকা সেতুর প্রস্থ ১০.৫ মিটার। কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি খাল সুবারবার্ন হেডকাট চ্যানেলের বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে বানতলা পর্যন্ত প্রায় ৭.৩০ কিমি পলি উত্তোলন করে খালের সংস্কারের কাজও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদাক্রমে এই দুই লেনবিশিষ্ট পাকা সেতুটি নির্মাণের ফলে চৌবাগা, পশ্চিম চৌবাগা, বানতলা, আনন্দপুর, নিউটাউন, রাজারহাট, যাদবপুর, গড়িয়াহাট এলাকার মানুষ কম সময়ে সহজে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। সুবারবার্ন হেডকাট নিকাশি খাল সংস্কার হবার ফলে এলাকার বর্জ্য পদার্থ ও জল যেমন সহজেই নিষ্কাশিত হবে, তেমনি এলাকার পরিবেশও সুন্দর থাকবে। সেতুটি সঠিকভাবে ব্যবহারে ও নিকাশি খালে বর্জ্য পদার্থ সরাসরি না ফেলার জন্য সমস্ত এলাকাবাসীর কাছে আবেদনও রাখা হয় সভাতে। পাকা সেতুটি নির্মাণের ফলে এলাকার উন্নয়ন আরো একধাপ এগিয়ে গেল।